জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি
ম্যানুয়াল

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল

দেবল দেব
সুরাইয়া বেগম
নিলুফার হাই করিম
মোহাম্মদ জহিরউল্লাহ
মোঃ ইফতেখার আলী

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল

দেবল দেব, সুরাইয়া বেগম, নিলুফার হাই করিম,
মোহাম্মদ জহির উল্লাহ, মোঃ ইফতেখার আলী

প্রকাশকাল: জুন, ২০১৭

প্রকাশনায়:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাড়ি ৫৪ (৩এ), সড়ক ১১, ব্লক এফ,
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮-০২) ৫৫০৪২৩৪৫-৬
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.de
www.rosalux-southasia.org

মুদ্রণে:
দ্যা রিফ্লেক্টর
মুক্তবাংলা শপিং কমপ্লেক্স
মিরপুর-১, ঢাকা।

Manual on Agro-ecology

Debal Deb, Suraiya Begum,
Nilufer Hye Karim, Mohammad Zahir Ullah,
Md Iftekhar Ali

Published in: June, 2017

Published by:
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 54 (3A), Road 11, Block F,
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+88-02) 55042345-6
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Supported by:
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www. rosalux.de
www.rosalux-southasia.org

Printed by:
The Reflector
Mukto Bangla Shopping Complex
MIrpur-1, Dhaka

Sponsored by the Rosa Luxemburg Foundation e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany
Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. aus Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	০৫
কৃতজ্ঞতাস্বীকার	০৭
প্রথম অধ্যায়ঃ কৃষির বর্তমান অবস্থা	
১. ভূমিকা	০৯
২. বাংলাদেশের বর্তমান কৃষির চালচিত্র	০৯
৩. কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব	১১
৪. রাসায়নিক নির্ভর কৃষির কুফল	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির মূলনীতি	
১. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি কী?	১৩
২. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির আবশ্যক উপাদান	১৩
৩. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি থেকে চাষীর কি উপকার হবে?	১৫
তৃতীয় অধ্যায়ঃ কৃষি-ইকোসিস্টেম	
১. জীববৈচিত্র্য ও ইকোসিস্টেম	১৬
২. কৃষি- ইকোসিস্টেমের গাঠনিক জটিলতা	২০
৩. কৃষি-ইকোসিষ্টেমে পারস্পরিক সম্পর্ক	২০
৪. কৃষি-ইকোসিস্টেমের সমৃদ্ধতা ও জটিলতা বৃদ্ধির উপায়	২৩
চতুর্থ অধ্যায়ঃ মাটি ব্যবস্থাপনা	
১. মাটির সংরক্ষণ ও উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়	২৬
২. পানির সুষ্ঠু ব্যবহার	৩৯
পঞ্চম অধ্যায়ঃজীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষের পদ্ধতি	
১. শস্য বৈচিত্র্য বাড়িয়ে তোলবার বিভিন্ন পদ্ধতি	৪১
ক) অন্তর্বতী শস্য চাষ	৪২
খ) পর্যায়ক্রমে বিবিধ শস্যের চাষ	৪৪
গ) চক্রাবর্তী চাষ ও বিভিন্ন শস্যের সঙ্গবদল	৪৫
ঘ) শস্যের জাতের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি	৪৬
ঙ) বহুতলীয় মিশ্র চাষ	৪৭
২. অ-শস্য সঙ্গী উদ্ভিদের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি	৪৯
ক. পুষ্টি উপাদান সরবরাহ	৪৯
খ. বাড়তি সঙ্গী উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ	৫০
গ. শস্যের শত্রু পোকা দমন	৫০
ঘ. শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ	৫১

৩. কৃষি-ইকোসিষ্টেমের অন্তর্গত প্রাণীদের প্রজাতি বৈচিত্র্য বাড়ানো	৫৩
ক. পুষ্টি উপাদান সরবরাহ	৫৩
খ. শস্যের শত্রু প্রাণী দমন	৫৩
গ. শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ	৫৫
৪.কৃষি-ইকোসিষ্টেমের অন্তর্গত অনুজীবদের প্রজাতি বৈচিত্র্য বাড়ানো	৫৬
৫. আরণ্যক কৃষি	৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিতে নারী	৫৮
সপ্তম অধ্যায়ঃ সামূহিক (কমিউনিটি) সম্পদের উপর অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৬০
অষ্টম অধ্যায়ঃ উপসংহার	৬৩
সংযুক্তি-১ ফসলের বিভিন্ন পরিবারের ছবি	৬৫
তথ্য সূত্র	৭০

মুখবন্ধ

মানব সমাজ জীব জগতেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং কৃষি জ্ঞান ও কৃষি চর্চা মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত এক অনিবার্য কার্যক্রম। এ কারণে কৃষি কেবল জীব হিসাবে মানব অস্তিত্ব বিকাশের হাতিয়ারই নয়, মানব কল্যাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব নিরাপদ ও বিকাশমান রাখার অন্যতম উপায়ও বটে। এ বিবেচনা থেকে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উত্তরাধুনিক সভ্যতায় কৃষি ও জীববৈচিত্র এ দুটি বিষয়কে নিবিড়ভাবে পরস্পর নির্ভর বিষয় হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

যদিও আমরা জানি যে, মানবসভ্যতা যুগপৎভাবে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও খাদ্য সংকটের কবলে পড়ায় ১৯৪০ এর দশকে কেবল ক্ষুধামুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে অধিক উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করা হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার, পোকামাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার, সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং নানান যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষি সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে। কৃষিতে এ সকল প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহারের ফলে মারাত্মক হুমকির মুখোমুখী হয় জীববৈচিত্রপূর্ণ কৃষি পরিবেশ। বহু প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির স্বাভাবিক জীবনধারণ ও বিকাশ এতটাই বাধাগ্রস্ত হতে থাকে যে তাদের অস্তিত্ব হয়ে ওঠে সংকটাপন্ন ও বিলীয়মান। এই প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যেই বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে - যার প্রবল প্রভাব পড়েছে জীববৈচিত্র সুরক্ষার উপর। জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কৃষিতে এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের উন্নত জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় ভূমন্ডলীয় পরিসরে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেইসাথে প্রকৃতিতে জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানান পরিবর্তন মানব সভ্যতার বিকাশের পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে জীববৈচিত্র সুরক্ষা করে কৃষি চর্চার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সামনে চলে এসেছে। কৃষি উৎপাদনে মাটির জৈব গুণাগুণ অটুট রাখা এবং জীববৈচিত্র বিনষ্টের জন্য দায়ী রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের তাগিদ তাই ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ইতোমধ্যেই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনাসহ নানান বিকল্প ফসল উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের সূচনা ঘটেছে।

জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি ভাবনা আদি কৃষি ভাবনার সূত্রে গ্রথিত হলেও বর্তমানে প্রচলিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার একটি অন্যতম ও আধুনিক বিকল্পের অন্বেষণও বটে। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব)-এর পক্ষ থেকে জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্যোগ এই বিকল্প অন্বেষণেরই বাস্তব দৃষ্টান্ত। কৃষকের নিত্যদিনের ফসল উৎপাদন কার্যক্রমে এ ম্যানুয়ালে বর্ণিত জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে - এ প্রত্যাশা থেকে একদল আত্মবিশ্বাসী বিশেষজ্ঞ এ ম্যানুয়াল প্রস্তুতির পেছনে অঙ্গীকারদীপ্ত মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করেছেন। আমি তাদের অভিনন্দন জানাই, সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ-কে এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য। আমি সর্বান্তকরণে এই ম্যানুয়ালের বহুল প্রচার এবং সার্থক প্রয়োগ কামনা করছি।

কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান
প্রাক্তন মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জন্মলগ্ন থেকেই কাজ করছে গতানুগতিক ধারার বাইরে এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে। সেই প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন যাবত রিইব কাজ করছে কৃষি ও কৃষক সমাজ নিয়ে। রিইব বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার, কৃষির চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ নিয়ে এর আগে কাজ করেছে এবং বর্তমানে কাজ করছে ''প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা (২০১৭)'' শীর্ষক বিষয়ে। প্রকল্পভিত্তিক এই কাজের মূল লক্ষ্য জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান অন্বেষণ এবং বিকিরণ করা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সেই লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এই জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল। রিইব এর এই কাজে দীর্ঘদিন ধরে গভীর এবং আন্তরিক সহায়তা করে যাচ্ছে জার্মানীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং (আরএলএস)। তাদের সহায়তা ব্যতিত এই ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা সম্ভব হত না। এই প্রক্রিয়ায় রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং- সাউথ এশিয়া অফিসের রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ স্টেফান মেন্টশেল-এর সহযোগিতা উল্লেখ্য এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার বিনোদ কষ্টি এক্ষেত্রে বিশেষ আত্মিক এবং ব্যবহারিক সহায়তা প্রদান করেছেন। আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল তাঁদের প্রতি ।

ম্যানুয়ালটি তৈরি হয়েছে মূলত: অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে, ৬-দিন ব্যাপী একটি কর্মশালার মাধ্যমে। কর্মশালার প্রথম দিন ভারতের কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. দেবল দেব-এর উপস্থাপনায় বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দলের কৃষি বিষয়ে নিবেদিত কর্মীবৃন্দ ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তু নির্ধারণে সহায়তা করেছেন। পরবর্তীতে ঢাকার অদূরে একটি আবাসিক ভেন্যুতে ১০ জনের একটি দল ড. দেবল দেব- এর নেতৃত্বে ম্যানুয়ালটির খসড়া প্রস্তুত করে। পঞ্চম দিন পুনরায় প্রথম দিনের বিশেষজ্ঞবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যাতে খসড়া ম্যানুয়ালের উপর আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করা যায়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীবৃন্দ ড. রনজিত সেন ও ড. খুরশিদ আলম; বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীবৃন্দ ড. পান্না আলী ও মোঃ সিরাজুল ইসলাম; শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. অশোক কুমার ঘোষ; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ শাহেদ হাসান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আশরাফুল ইসলাম; কর্মজীবী নারীর পরিচালক সানজিদা সুলতানা, শুদ্ধ কৃষি খামার-এর পরিচালক কাকলী খান, বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন অন্যতম। তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রাকৃতিক কৃষির দেলোয়ার জাহানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কর্মশালায় তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষ পদ্ধতি খামারে সরেজমিনে অবলোকন ও হাতে কলমে জৈব কৃষি চর্চা করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ভারতের কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. দেবল দেব-এর প্রতি, তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা এবং কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এই ম্যানুয়াল অধরা থেকে যেত। এই ম্যানুয়ালের যাবতীয় বিষয়বস্তুর যে গভীরতা এবং জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির মাধ্যমে কৃষি ও প্রতিবেশকে সামনের দিকে এগিয়ে

নিয়ে যাবার যে দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে, তার পেছনে ড. দেবল দেবের অর্ন্তনিহিত জ্ঞান সবিশেষ সহায়তা করেছে প্রত্যক্ষভাবে।

কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান সমৃদ্ধ মুখবন্ধ লিখে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ম্যানুয়ালের সার্বিক প্রস্তুতির জন্য রিইব নিয়োগকৃত কনসালটেন্ট ড. জহির উল্লাহ অভিজ্ঞতা সহযোগে ম্যানুয়ালকে সমৃদ্ধ করাসহ এর আঙ্গিকগত দিককে পরিমার্জন করেছেন। প্রকল্পের গবেষণা সহকারীবৃন্দ- মোঃ আনোয়ার হোসেন, বগুড়া; মোজাফ্ফর আহমেদ, চট্টগ্রাম; চৈতন্য কুমার দাস, সাতক্ষীরা; ও মোঃ আবুল ফজল, নীলফামারী- উপস্থিত থেকে স্থানীয় জ্ঞান সরবরাহ করেছেন। এই প্রকল্পের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ ড. নিলুফার হাই করিম, মোঃ ইফতেখার আলী এবং উম্মে কুলসুমের প্রতি কৃতজ্ঞতা তাঁদের কার্যকরী সহযোগিতার জন্য। রিইব-এর চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি এবং নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা ম্যানুয়ালটি সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভুমিকা রেখেছেন।

পরিশেষে ম্যানুয়ালটি সারা বাংলাদেশের সকল কৃষককে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার মাধ্যমে সুস্থায়ী পরিবেশ বজায় রাখতে প্রাণিত করবে এই আশা করি।

সুরাইয়া বেগম
প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব।

কৃষির বর্তমান অবস্থা

১. ভূমিকা

বর্তমান পৃথিবীতে এখন যেসব বিষয় মূলত: বৈশ্বিক পরিসরে বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে তার মধ্যে কৃষি প্রতিবেশ বা এগ্রোইকোলজি হচ্ছে অন্যতম বিষয়। কারণ এই বিষয়টি এই পৃথিবীতে বসবাসরত যাবতীয় প্রাণীর অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত, যা কিনা বর্তমানে বিভিন্নভাবে সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্যা কোন একটি বিশেষ দেশের সমস্যা নয়, বরং এটি সর্বজনীন। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সমস্যা প্রকট। প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে যে, যে গ্রহে আমরা বাস করছি তার জনগণকে কে খাদ্য যোগান দেবে এবং সুস্থ রাখবে - রাসায়নিক কৃষি নাকি জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি? এই প্রশ্ন এখন সবার সামনে চলে এসেছে, কারণ সনাতনী কৃষির বদলে বর্তমানের কৃষি অনেক বেশি রাসায়নিক নির্ভর এবং এর প্রভাব বেশিরভাগই পরিবেশের জন্য সহায়ক নয়। রাসায়নিক দ্রব্যাদির (সার, কীটনাশক, বালাইনাশক) নির্বিচার ব্যবহারে জলজ, প্রাণীজ ও ক্ষেতে থাকা উপকারী প্রাণীগুলো সময়ের আগেই অহরহ মারা যাচ্ছে। ফলে বিপর্যস্ত হচ্ছে পরিবেশ, বিনষ্ট হচ্ছে কৃষি জমির উর্বরতাশক্তি। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য। ইতিমধ্যে দেশ থেকে অনেক জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আরও অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। যার ফলশ্রুতিতে প্রাণীজগতে খাদ্য শৃঙ্খলের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে, যেখানে প্রাণীকুল অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতিগুলো ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া রাসায়নিক নির্ভর কৃষির কারণে খাদ্যে বিভিন্ন মাত্রায় বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি বেড়ে যাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে এসব বিষাক্ত খাবার খেয়ে মানুষ হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, প্যারালাইসিস এবং কিডনি, লিভার ও চোখের ক্ষতিসহ মারাত্বক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এসব সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা এবং সমস্যা মোকাবেলা করা আমাদের জন্য জরুরী। এ বিষয়ে আমাদের সামনে পথ দেখাচ্ছে এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি।

২. বাংলাদেশের বর্তমান কৃষির চালচিত্র

কৃষি হচ্ছে বাংলাদেশের অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত শক্তি। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ১৭% এবং মোট শ্রমশক্তির ৪৫% এর বেশি কৃষিতে জড়িত।[১] বাংলাদেশের মোট ২,৮৬,৯৫,৭৬৩ পরিবারের মধ্যে ১,৫১,৮৩,১৮৩ টি পরিবার কৃষি পরিবার হিসেবে বিবেচিত।[২] দেশের মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫,৬০,৯৬৪.৭৫ হেক্টর এবং ফসলের নিবিড়তা ১৯২%। বাংলাদেশে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৩,৪৭,০০,০০০ মেট্রিক টন ধান ও ৩৭,২৯,০০০ মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন

হয়।[৩] তবে বর্তমানের এই ফসল উৎপাদন হচ্ছে প্রধানত রাসায়নিক উপকরণের মাধ্যমে যার অধিকাংশই আমদানী নির্ভর।

উৎপাদনের মৌলিক অংশ বীজের সরবরাহের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে বিভিন্ন ফসলের মোট ২,২০,০৩০ মেট্রিক টন বীজ সরবরাহ করা হয়েছিল।[৪] যার মধ্যে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি) ৬৪.০৯%, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭.১৮% এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৮.৭২% বীজ সরবরাহ করেছিল। এছাড়া সরবরাহ করা বোরো ধানের মধ্যে উচ্চফলনশীল (৯০.৬৬%), স্থানীয় (০.০৪%) ও হাইব্রীড (৯.২৯%) বীজের ৬২.১৪% বিএডিসি, ৮.৪৯% কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ২৯.৩৫% বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সরবরাহ করেছিল। এই বোরো মৌসুমে বিএডিসি ও ৩২ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে হাইব্রীড ধান বীজ আমদানির অনুমোদন পায়, যার পরিমাণ ছিল: এফ-১ বীজ: ৫,৪২৩ মেট্রিক টন, 'এ' লাইন বীজ: ১,৩৯,৯৭৫ কেজি এবং 'আর' লাইন বীজ: ৫১,৬২৭ কেজি। আর মোট দানাদার ফসলের (ধান, গম ও ভূট্টা) বীজের ৬৮.৭৭% বিএডিসি, ৮.৯৮% কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ২২.২৩% বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সরবরাহ করেছিল। তবে সবজির বীজের ১৪.৬৪% বিএডিসি এবং ৮৫.৯৬% বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সরবরাহ করেছিল।

সারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২০১৬ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী দেশে রাসায়নিক সারের চাহিদা বার্ষিক ৫০ লক্ষ টন, যার মধ্যে ২৭ লক্ষ টন ইউরিয়া সার ও ২৩ লক্ষ টন অন্যান্য সার।[৫] আর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদেশ থেকে রাসায়নিক সার আমদানি করার জন্য খরচ হয়েছিল প্রায় ৮,১৮৫ কোটি টাকা (১,০৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।[৬] এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি উপকরণ (সার, যন্ত্রপাতি) ক্রয়ে ভর্তুকি বাবদ প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি উপকরণ ক্রয়ে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা।[৭]

ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৬৫ সালের পূর্বে তেমন কীটনাশক ব্যবহার হয়নি। সেই বছরই প্রথম সরকার তিন মেট্রিক টন কীটনাশক আমদানি করে। এরপর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সরকার বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে ১০০ ভাগ ভর্তুকিসহ কীটনাশক বিতরণ করে। ১৯৭৯ সালে এই খাতে ভর্তুকি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয় এবং কীটনাশক ব্যবসা বেসরকারি খাতে হস্তান্তরিত হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিকের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ, উচ্চফলনশীল ধান ও সবজি চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, কীটনাশক ব্যবসায়ীদের দ্বারা কৃষকের মধ্যে কীটনাশক ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি এবং অজ্ঞতাবশত কৃষক কর্তৃক অতিরিক্ত পরিমাণে এবং মাঝেমধ্যে অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও কীটনাশক ব্যবহার অন্যতম। কৃষকদের মধ্যে সবজিতে বিষ দেয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী এবং কোন কোন সবজিতে কৃষকরা কয়েকটি কীটনাশকের ককটেল বানিয়ে পোকা দমনের জন্য জমিতে প্রয়োগ করে থাকেন। যার ফলে ফসলের জন্য উপকারী এবং ক্ষতিকারক - সকল উদ্ভিদ যারা জমিতে মূল ফসলের সঙ্গী উদ্ভিদ হিসেবে থাকে, তারা মারা যায়, রাসায়নিক নির্ভর কৃষির সংজ্ঞায় যারা 'আগাছা' হিসাবে চিহ্নিত। এসব উদ্ভিদ দমনে বর্তমানে আগাছানাশকও ব্যবহার হয়ে

থাকে। ২০১৬ সালে দেশে ৩৩,৩৭১,৬০ মেট্রিক টন বালাইনাশক প্রয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৪,২৬৬.১৪ মেট্রিক টন কীটনাশক, ৮৩.২৮ মেট্রিক টন মাকড়নাশক, ১৪,৮৯৬.০৬ মেট্রিক টন ছত্রাকনাশক, ৪,০১৫.৩৩ মেট্রিক টন আগাছনাশক এবং ৭৪.৭৯ মেট্রিক টন ইদুরনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৮]

দেখা যাচ্ছে যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানের কৃষিতে প্রচুর ইনপুট সরবরাহ করতে হয় যা কিনা ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ব্যয়বহুল এবং প্রতিবেশের জন্যে হুমকিস্বরূপ। এ কৃষিকে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি না বলে রাসায়নিক নির্ভর কৃষি হিসাবে আখ্যায়িত করতে হয়। কারণ এখানে অধিক ফসল উৎপাদন ও পোকামাকড় দমনের জন্য রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ করা হয়। এ ধরনের রাসায়নিক নির্ভর কৃষির সূত্রপাত হয়েছিল সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে।

৩. কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব

"সবুজ বিপ্লব" মানে হল কৃষি পদ্ধতির সংস্কার করার একটি ব্যাপক আন্দোলন যা প্রথমে শুরু হয়েছিল মেক্সিকোতে ১৯৪০ সালে। আমেরিকান বিজ্ঞানী নরমেন বোরলগ (যাকে সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়) এর গবেষণার ফলাফল হিসাবে দেখা যায় গমের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের ফলে বাম্পার ফলন সম্ভব এবং এর প্রেক্ষিতে মেক্সিকোতে খাদ্য উদ্বৃত্ত দেখা যায়। ১৯৫০-৬০ এর মধ্যে সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহিত হয় এবং তারপর বাকী পৃথিবী গ্রহণ করে। উপমহাদেশে সবুজ বিল্পবের প্রবর্তন শুরু হয় খাদ্য উৎপাদনের নিজস্ব সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে যা বিশ্বের জনাকীর্ণ এ অঞ্চলের দ্রুত-বর্ধনশীল খাদ্য চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হয়। সবুজ বিল্পব তার প্রারম্ভিক বছরগুলোতে সফলভাবে আবির্ভুত হয়, যেখানে ফসলের বাম্পার ফলন বছরের পর বছর ফলতে থাকে এবং খাদ্যে উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু উচ্চফলনশীল ফসলের প্রারম্ভিক সফলতার পর, বাস্তবতা স্পষ্ট হতে শুরু করে। পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং প্রচলিত কৃষি চর্চার উপর এর তীব্র নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। রাসায়নিকের অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে ফসলের পোকা ও বালাইয়ের রাসায়নিকের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট সময় পর পোকার শরীরে নির্দিষ্ট রাসায়নিকের প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায় ফলে তাদের দমন করতে অধিক পরিমাণে ও আরও শক্তিশালী বালাইনাশক ও উদ্ভিদনাশক কিনতে কৃষক বাধ্য হয়। এ সকল উচ্চমূল্যের যোগান কৃষি উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ফসল উৎপাদন খরচ প্রবলভাবে বেড়ে যায়, যেখানে ফলন বছরের পর বছর ক্রমশ: কমতে থাকে। অনেক চাষী কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে কৃষি শ্রমিক বা দিনমজুর বা অকৃষি পেশায় চলে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি গ্রামের মানুষ কাজের খোঁজে শহরে চলে আসতেও বাধ্য হয়। অন্যদিকে খাদ্য যোগানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশের কৃষি নীতি কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও বানিজ্যিকীকরণের দিকে ঝুকে পড়েছে। যা কিনা এই বিষয়ে নতুন করে আমাদেরকে ভাবতে এবং কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. রাসায়নিক নির্ভর কৃষির কুফল

ষাটের দশকের পর থেকে যে রাসায়নিক নির্ভর কৃষি এই উপমহাদেশে চালু হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে দেশের খাদ্য সুরক্ষা এবং কৃষকের স্বয়ম্ভরতা আজ বিপন্ন। এই বিপন্নতার মূলে রাসায়নিক নির্ভর কৃষির অনেকগুলো কুফল নিম্নরূপঃ

ক) মাটির উর্বরতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে

খ) অথচ উৎপাদন ক্রমশ কমছে।[৯]

গ) কীটনাশক বিষের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে।

ঘ) অথচ শত্রু পোকার সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে চলেছে।

ঙ) সেচের প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ পানি যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলেঃ

অ) পানির স্তর ক্রমশ নিচে চলে যাচ্ছে, পানির মজুদ নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে এবং সেচের খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

আ) অন্তত ৪২ টি জেলায় পানিতে আর্সেনিক দূষণ বেড়ে যাচ্ছে।[১০]

চ) খাদ্য ও পানিতে এই রাসায়নিক বিষ মিশে যাচ্ছে, ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে এবং ক্যানসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধিও বেড়ে চলেছে; মাতৃদুগ্ধেও এই বিষ মিশে যাচ্ছে এবং শিশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[১১]

ছ) চাষীর বন্ধু প্রাণীরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, অনেক পোকা, মাছ, সরিসৃপ, ব্যাঙ, পাখি এবং মাটিতে বসবাসকারী অনেক প্রাণী ইতোমধ্যেই লোপ পেয়ে গেছে।[১২]

জ) কৃষক বীজের জন্য বাজারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

ঝ) কৃষির যাবতীয় সরঞ্জাম (ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্প, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, সার প্রভৃতি) এর জন্য কৃষক বিশেষ কিছু কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে।

ঞ) এক শস্যের নিবিড় চাষের (মনোকালচার) ফলে শস্য বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে।

ট) কৃষির যাবতীয় পরম্পরাগত জ্ঞান হারিয়ে কৃষক কৃষি পদ্ধতির জন্যও বিভিন্ন কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে।

ঠ) যন্ত্রনির্ভরতা ও বাজার নির্ভরতার ফলে ঐতিহ্যবাহী কৃষি সরঞ্জাম (লাঙল, ঢেঁকি, জাঁতা, ঘানি প্রভৃতি) এবং বলদ ও মহিষের ব্যবহার লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

ড) চাষের খরচ অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও রোজগার যথেষ্ট না হওয়ায় কৃষক কৃষিকাজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

ঢ) কৃষি সংস্কৃতি ও স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে।

এগুলোর বিপরীতে পৃথিবীব্যাপী কৃষিবিজ্ঞানী, পরিবেশবিজ্ঞানীরা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিকে মুক্তির পথ হিসেবে সুপারিশ করছেন।[১৩]

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির মূলনীতি

১. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি কী?

রাসায়নিক কৃষি প্রচলনের আগে পর্যন্ত যে কৃষি পদ্ধতি দশ হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবীতে চালু ছিল সেই সাবেকী কৃষি ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নির্ভর, জীববৈচিত্র্য নির্ভর। অর্থাৎ এই সাবেকী কৃষি পদ্ধতি কোন বিকল্প পদ্ধতি নয়, এটাই ছিল মূলধারা, যতদিন না রাসায়নিক ও যন্ত্রশিল্প ব্যবসায়িক লাভের উদ্দেশ্যে এই কৃষিকে দখল করে। আজ সমস্ত কৃষি রাসায়নিক, বীজ ও যন্ত্র কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির দখলে।[১৪] জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি কোম্পানির দখল থেকে চাষীকে মুক্তি দেয়, কারণ বীজ, সার ও শত্রু পোকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চাষীকে বাইরের কোন বস্তু বা সংস্থার উপর নির্ভর করতে হয়না।

২. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির আবশ্যক উপাদান

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির আবশ্যিক উপাদানের মধ্যে রয়েছেঃ

ক) যাবতীয় শস্যের বীজ চাষীদের হাতে রাখা, যাতে কোন বীজ কিনতে না হয়;

খ) স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা, যাতে বাইরে থেকে কোন সার প্রয়োগের দরকার না হয়;

গ) স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ ব্যবহার করে শত্রু পোকা বা আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা;

ঘ) শস্যের সঙ্গী উদ্ভিদকে 'আগাছা' বলে চিহ্নিত না করে তাদের যথাযথ ব্যবহার করা;

ঙ) ভূ-উপরিস্থ বা বৃষ্টির পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী শস্য নির্বাচন করা, যাতে সেচের জন্য ভূ-গর্ভের পানি ব্যবহার করার প্রয়োজন না হয়;

চ) কৃষিক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য লালন করে তাকে যথাসম্ভব বাড়ানো;

ছ) স্থানীয় জলবায়ু ও মাটির উপযোগী শস্য বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণের জ্ঞান এবং স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপযোগিতা বিষয়ক জ্ঞান প্রয়োগ করা ও সমৃদ্ধ করা।

এখানে রাসায়নিক নির্ভর কৃষি ও জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির মধ্যে পার্থক্যগুলো বর্ণনা করা হলো।

সারণি ১ঃ রাসায়নিক ও জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	রাসায়নিক নির্ভর কৃষি	জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি
বীজ	ক. বাজার থেকে কিনতে হয় খ. কোন বিশেষ পুষ্টি উপাদান থাকে না গ. পুষ্টি উপাদান অনুপাতে কম থাকে ঘ. কোন বিশেষ ঔষধিগুণ থাকে না	ক. কৃষকের ঘরে থাকে খ. ফসলের বিশেষ কিছু জাতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থাকে গ. পুষ্টি উপাদান অনুপাতে বেশী থাকে ঘ. বিশেষ কিছু জাত ঔষধিগুণসম্পন্ন
সার	ক. কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ খ. বাজার থেকে কিনতে হয় গ. মাটির জীবাণু ও অন্যান্য প্রাণী (কেঁচো, ক্যারা বা কেন্নো, গুবরেপোকা, পিপড়া প্রভৃতি) মারা যায় ঘ. নাইট্রোজেন চক্র বিঘ্নিত হয়	ক. জৈব পদার্থ খ. নিজের জমিতে তৈরি করা যায় গ. মাটির জীবাণু ও অন্যান্য প্রাণী ভাল থাকে ও বৃদ্ধি পায় ঘ. নাইট্রোজেন চক্র স্বাভাবিক থাকে
কীটনাশক	ক. কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ খ. বাজার থেকে কিনতে হয় গ. সকল বন্ধু প্রাণী মারা যায় ঘ. বাতাস, মাটি ও পানিকে বিষাক্ত করে দেয় ঙ. মাটিতে বিষক্রিয়া কমপক্ষে ৬ মাস থেকে ২০ বছর থেকে যায় চ. প্রয়োগের সময় সাবধানতা না নিলে, কিডনী, লিভার, ত্বক এবং স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছ. খাবার ও পানীয় জলের মধ্যে বিষ থেকে যায়	ক. জৈব পদার্থ খ. অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, তাই খরচ নেই গ. সকল জীববৈচিত্র্য অটুট থাকে ঘ. বাতাস, মাটি ও পানির গুণাগুন অক্ষত থাকে ঙ. বিষক্রিয়া সর্বাধিক সাত দিন থাকে চ. জৈব কীটনাশক (যদি কখনো) প্রয়োগ করা হলে সাবধানতার প্রয়োজন নেই ছ. খাবার ও পানি নিরাপদ (বিষমুক্ত) থাকে
উদ্ভিদনাশক বা ঘাসমারা	ক. সমস্ত রকম উদ্ভিদ মারা যায় খ. ব্যায়বহুল গ. সমস্ত রকমের ব্যাঙ, ব্যাঙাচি ও জলের পোকা মারা যায় ঘ. বিষক্রিয়া ১৫ বছর পর্যন্ত বজায় থাকে	ক. সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় খ. খরচ নেই গ. সকল জীববৈচিত্র্য অটুট থাকে
যন্ত্র	ক. বাজার থেকে কিনতে হয় খ. যন্ত্র চালাবার জন্য জ্বালানী কিনতে হয় গ. জ্বালানী ব্যবহার থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়	ক. প্রয়োজন নেই খ. প্রয়োজন নেই

শ্রম	সার, কীটনাশক, উদ্ভিদনাশক ইত্যাদি প্রয়োগের জন্য বাড়তি শ্রম বা মজুরি ও সময় ব্যয় হয়	কোন বাড়তি শ্রম বা মজুরি নেই
উৎপাদন	ক. উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমতে থাকে খ. প্রান্তিক জমিতে (খরাপ্রবণ, জলাজমি ও সমূদ্র কূলবর্তী নোনা জমি, শুস্ক, পাবর্ত্য ঢাল জমি) উৎপাদন শূণ্য বা প্রায় শূণ্যের কাছাকাছি	ক. উৎপাদনের হারের সমতা বছরের পর বছর বজায় থাকে খ. প্রতি্টি জমির উপযোগী স্থানীয় বীজ উৎপাদনক্ষম

৩. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি থেকে চাষীর কি উপকার হবে?

ক) উৎপাদনের হারের সমতা বছরের পর বছর বজায় থাকবে

খ) চাষীকে বীজ, সার প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য খরচ করতে হবে না

গ) সেচের প্রয়োজনে ভূগর্ভের পানি নিঃশেষ হবে না

ঘ) কোন বিষ প্রয়োগ হবে না, সুতরাং

অ) কোন প্রাণী, উদ্ভিদ লোপ পাবে না,

আ) মানুষের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হবে না

ই) পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে

ঙ) শস্যের অনেক সাবেকী জাতে বিশেষ কিছু পুষ্টি উপাদান থাকে, যা আধুনিক কোনও জাতে পাওয়া যায় না। লাল গোটাল ও দুধেবোলতা জাতের ধানে প্রচুর পরিমাণে লোহা ও ভিটামিন বি$_{২}$ থাকে[১৫]; কালজোহা ও রামভোগ ধানের চালে প্রচুর ক্যানসার প্রতিরোধী এন্টি-অক্সিড্যান্ট যৌগ পাওয়া যায়, যা আধুনিক কোনও ধানে অনুপস্থিত।[১৬]

চ) বাইরের কোনও কোম্পানি লাভ করতে পারবে না, ফলে চাষী হবে স্বনির্ভর ।

ছ) যৌথ বীজ ভান্ডার থেকে চাষীরা বীজের সংগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারবেন ।

জ) কমিউনিটির মধ্যে উৎপাদকের হাট বসবে, ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দামের জন্য বাইরের বাজারদরের উপর নির্ভর করতে হবে না।

কৃষি-ইকোসিস্টেম

১. জীববৈচিত্র্য ও ইকোসিস্টেম

জীবাণু বা অনুজীব থেকে হাতি, তিমি পর্যন্ত তাবৎ প্রাণী, উদ্ভিদ ও ছত্রাক- সকলের সমাহারকে বলা হয় জীববৈচিত্র্য। কেবলমাত্র এদের প্রজাতি নয়, প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন জাতও এই জীববৈচিত্র্যের অন্তর্গত। তার সঙ্গে, বিভিন্ন প্রজাতিকে যে বিভিন্ন রকম বাসস্থানে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়, সেই বাসস্থানগুলোও জীববৈচিত্র্যের অংশ। অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য তিন প্রকারঃ

ক. ইকোসিস্টেম বৈচিত্র্য (অরণ্য, নদী, পুকুর, সমূদ্র, পর্বত এবং চাষের ক্ষেত)

খ. প্রজাতির বৈচিত্র্য (ধান, বট, আম, গরু, কুকুর, ইলিশ, কাক প্রভৃতি)

গ. প্রজাতির মধ্যের জাতের বৈচিত্র্য (কাটারিভোগ ধান, বালাম ধান, গির গরু, মুলতানি গরু, জার্সি গরু, শাহীওয়াল গরু প্রভৃতি)

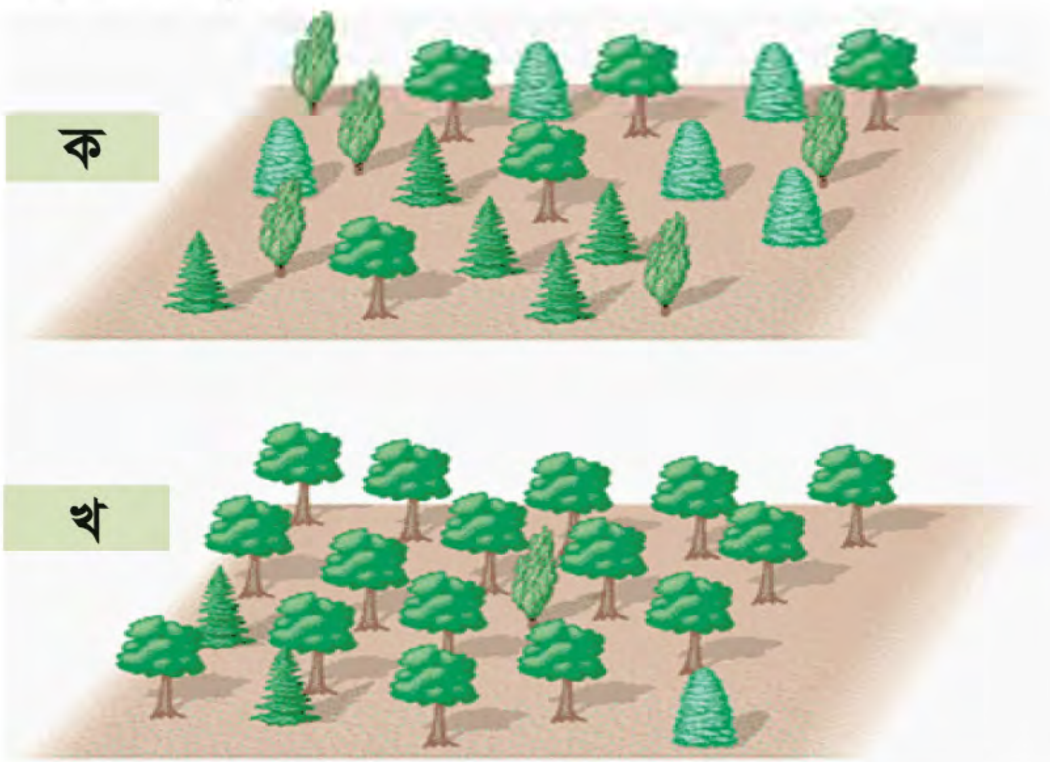

চিত্র ১: প্রজাতির বৈচিত্র্য। 'খ' এর তুলনায় 'ক' বেশি প্রজাতির বৈচিত্র্যময়
সূত্রঃ www. quia.com/jg/1140000list.html

বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক ও অনুজীব কোন একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করলে তাদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বাসস্থানে জল, মাটি, বাতাস এবং এখানে অবস্থিত সমস্ত জীব ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমাহারকে বলে ইকোসিস্টেম। যে ইকোসিস্টেমে অনেক প্রজাতি এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সম্পর্কের সংখ্যা যত বেশি হয়, সেই ইকোসিস্টেম তত জটিল ও সুস্থায়ী হয়। উদাহরণ হিসাবে এখানে একটি ইকোসিস্টেম দেখানো হল (চিত্র ২)।

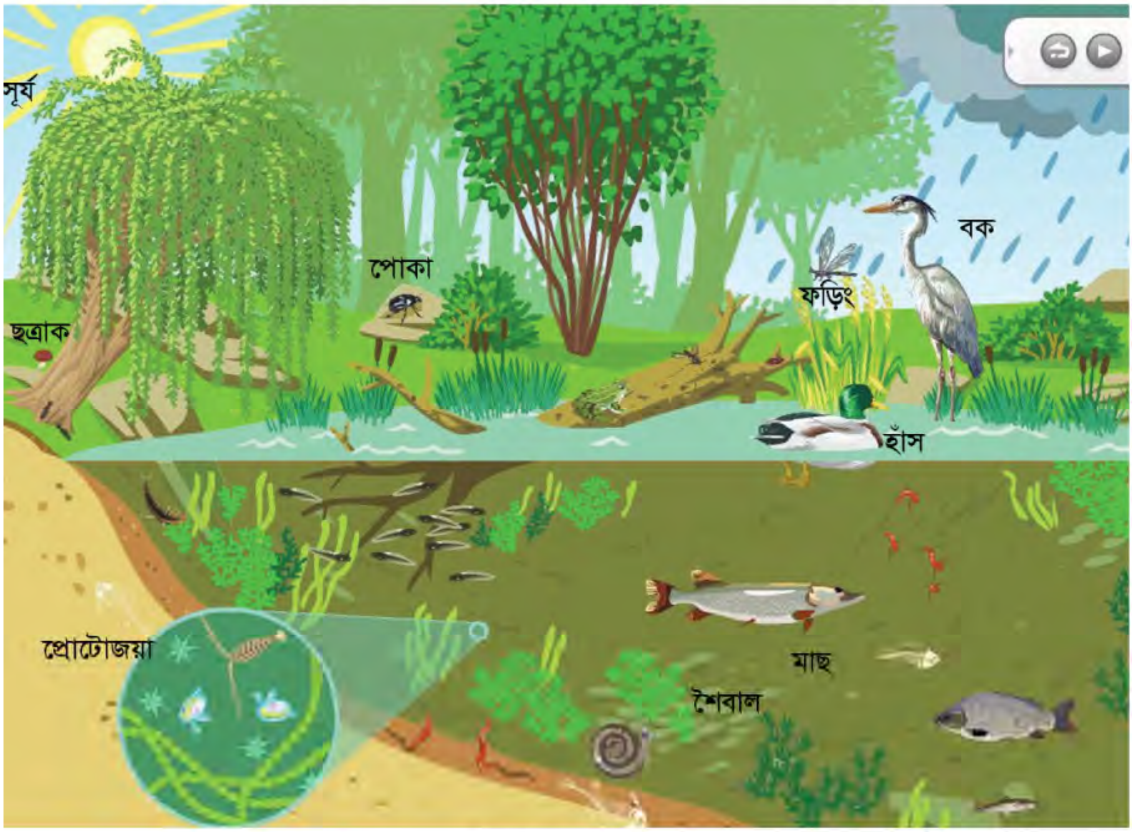

চিত্র ২: ইকোসিষ্টেম

সূত্র: www.play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.edumedia.a686.en

চাষের ক্ষেতের ইকোসিষ্টেম

চাষের ক্ষেতে প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন প্রজাতিকে সরিয়ে, মানুষ তার নিজের পছন্দমত অন্য অনেক প্রজাতিকে লালন করে, অর্থাৎ চাষ করে। যেমনঃ লাঙল দিয়ে বীজতলা তৈরি করার সময় ক্ষেতের যাবতীয় উদ্ভিদকে অপসারণ করে ধান বা বেগুনের বীজ বপন করা হয়। এই বীজগুলো রোপন করে যখন ক্ষেতে চাষ করা হয়, তখন এই ক্ষেতে নতুন একটি ইকোসিস্টেম সৃষ্টি হয়। এই ইকোসিস্টেমে শস্যের চারার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ, মাকড়সা, কেচো, কেন্নো, ব্যাঙ, পাখির নানান প্রজাতি পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন রকম সম্পর্ক গড়ে তোলে। সেসব সম্পর্ক হচ্ছে: খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্ক, পরজীবী-পোষক সম্পর্ক ও প্রতিযোগিতা সম্পর্ক ইত্যাদি। এই সমস্ত শস্যের বিভিন্ন জাত, সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি এবং তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সবরকম সম্পর্কগুলোর সমাহার ঐ চাষের ক্ষেতের ইকোসিস্টেম তৈরি করে। এখানে একটি ধান ক্ষেতের ইকোসিস্টেমের জীববৈচিত্র্যসমূহ দেখানো হল (চিত্র ৩)।

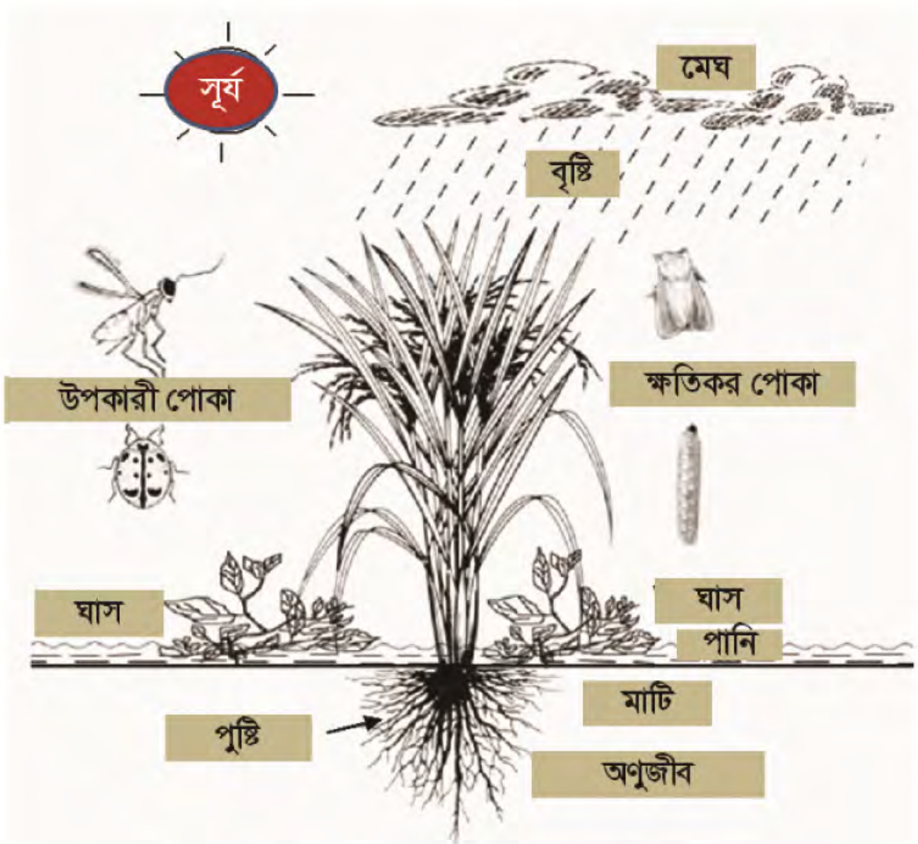

চিত্র ৩: একটি ধান ক্ষেতের ইকোসিস্টেমের জীববৈচিত্র্যসমূহ
সূত্র: www.ipm-af.org/ipm

খাদ্য উৎপাদনের যে-পদ্ধতি চাষের ক্ষেতের ইকোসিস্টেমের যাবতীয় প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় রেখে, তাদের মধ্যেকার সমস্ত রকম পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে বজায় রেখে খাদ্য উৎপাদন করে, তাকে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বলে। এই কৃষি পদ্ধতিতে এমন কোন বস্তু ব্যবহার করা যায় না, যাতে একটিও প্রজাতি বা কোন প্রজাতির একটিও জাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই কৃষি-ইকোসিস্টেমে কোনও প্রজাতিকে 'আগাছা' বা 'শত্রু' বলা যায় না, কারণ প্রতিটি প্রজাতির অস্তিত্ব এই ইকোসিস্টেমের সংহতি রক্ষার জন্য প্রয়োজন। ধান চাষের ক্ষেতে যত রকমের উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে জন্মায়, তারা প্রকৃতিগতভাবে ধানের সঙ্গী। তাদের কেউ ক্ষেতের মাটিতে নাইট্রোজেন যোগায়, কারও পাতা থেকে ফসফরাস আসে, কেউ ধানের শত্রু পোকাকে আকর্ষণ করে ধানকে বাঁচায়, কোন গুল্ম বিশেষ কয়েকটি মাকড়সার আবাসস্থল, যে মাকড়সা ধানের শত্রু পোকাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আবার যে- পোকা ধানের শত্রু, সে পোকা ধানের ক্ষেতে না থাকলে, বিশেষ কিছু পাখি বা অন্য প্রাণী এই ইকোসিস্টেম ছেড়ে চলে যাবে। এরকম যত বেশি সংখ্যক প্রজাতি কৃষি- ইকোসিস্টেমে থাকবে, সেই ইকোসিস্টেম তত বেশি ঘাতসহ হবে।

যে শস্য চাষ করা হবে, যদি সেই শস্যের একাধিক জাত একই ক্ষেতে থাকে, তাহলে সেই শস্যের রোগ ও শত্রুপোকার উপদ্রব সহজে এড়ানো যায়। জলবায়ুর তারতম্য ঘটলে (যেমন: খুব দেরীতে বর্ষা বা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি) একাধিক জাত যে ক্ষেতে চাষ হয়, সেই ক্ষেতের উৎপাদন একেবারে শুণ্য হয়না।

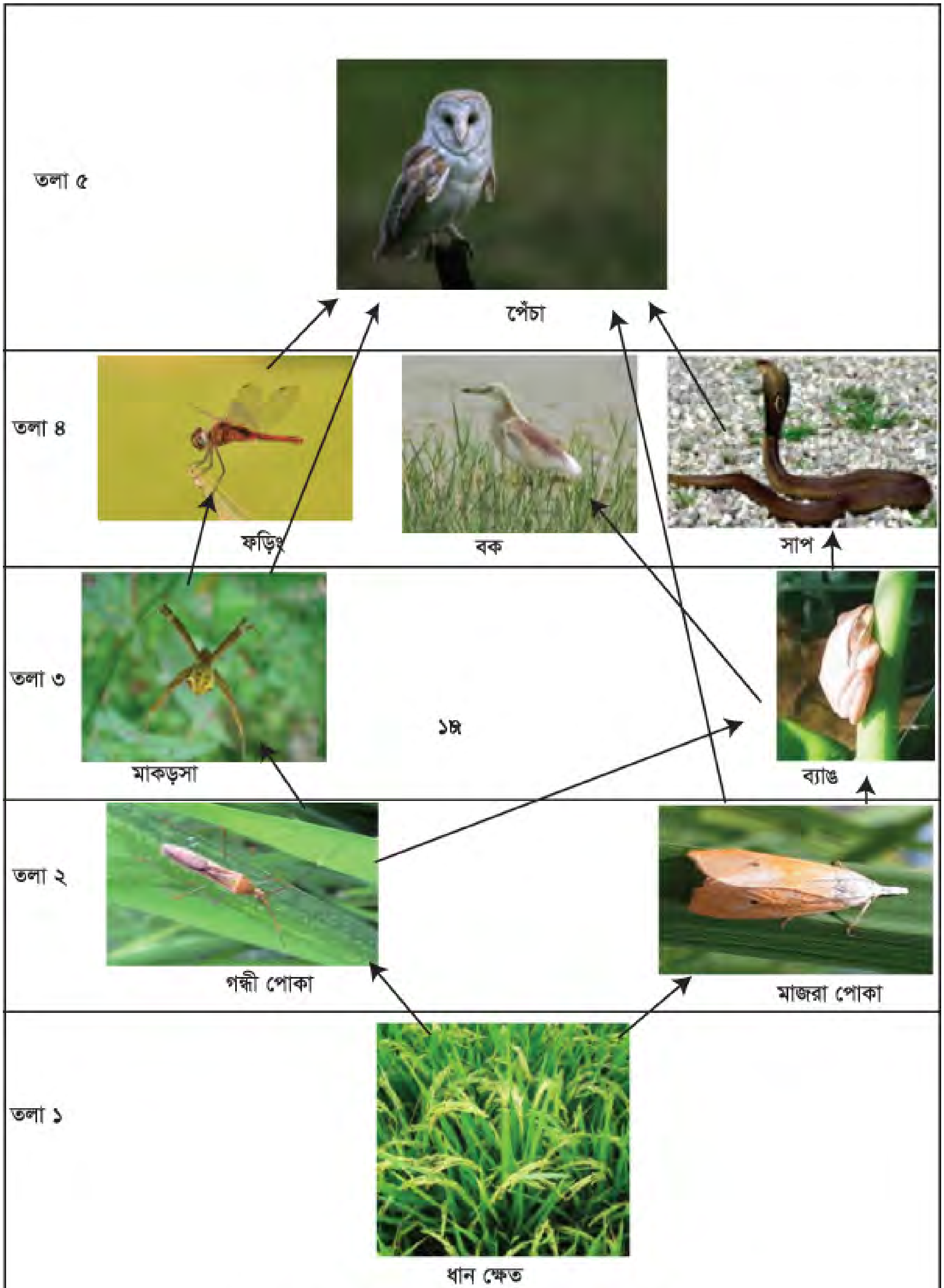

চিত্র ৪ : ধান ক্ষেতের ইকোসিস্টেমের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক

শস্যের বিভিন্ন স্থানীয় জাতের উৎপত্তি হয়েছিল আদি কৃষকের হাতে, যাঁরা স্থানীয় মাটির চরিত্র ও জলবায়ুর উপযোগী করে এই জাতগুলো নির্বাচন করেছিলেন। কয়েক শতাব্দী ধরে এসব জাতগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষিত। স্বাভাবিক আবহাওয়াতে এবং মাটিতে যথেষ্ট পুষ্টিগুণ থাকলে, স্থানীয় মাটি ও আবহাওয়াতে খাপ-খাইয়ে-নেওয়া এসব জাতের শস্যের উৎপাদনের হার বছরের পর বছর একই থাকে। সুস্থায়ী কৃষি-ইকোসিস্টেম গড়ে নিতে হলে, শস্যের এসব স্থানীয় জাতগুলো অবশ্য গ্রহণীয়।

২ কৃষি-ইকোসিস্টেমের গাঠনিক জটিলতা

একটা ইকোসিস্টেমের অনেক সর্ম্পকের মধ্যে খাদ্য- খাদক সম্পর্কগুলোকে একটি খাদ্য জালিকা রূপে বর্ণনা করা হয়। প্রতিটি প্রজাতিকে তার ছবি ও নাম দ্বারা এবং দুই প্রজাতির মধ্যেকার সম্পর্ককে একটি রেখা দিয়ে দেখানো হয়। খাদ্য জালিকাতে যত বেশি প্রজাতি থাকে, সেই ইকোসিস্টেম তত সমৃদ্ধ। এরকম খাদ্য জালিকাতে দুই বা ততোধিক স্তর বা তলা থাকে (চিত্র ৪)। যেমন, বহুতল বাড়ির বিভিন্ন তলা। সহজে বুঝবার জন্যে ৪ নং চিত্রে ধান ক্ষেতের ইকোসিষ্টেম কেমন হতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র-৪ এ একেবারে নিচের তলাটি হল উদ্ভিদ ও জীবাণু, যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে। যারা তাদের খেয়ে বেঁচে থাকে, তারা থাকে তার উপরের তলায়। যেমনঃ তৃণভোজী পশু বা গন্ধী পোকা। এই দ্বিতীয় তলার প্রাণীদের যারা খায়, তাদের বাস তৃতীয় তলায়, যেমনঃ গন্ধী পোকাকে খায় মাকড়সা বা ব্যাঙ। এই মাকড়সাকে খায় ফড়িং, আর ব্যাঙকে খায় সাপ বা কোঁচবক। তাই ফড়িং, সাপ আর কোঁচবক সবাই থাকে চতুর্থ তলায়। যে-প্রাণী একাধিক তলের বাসিন্দাদের খায়, তাদের বলে সর্বভুক প্রাণী। যেমন, পেঁচা খায় ব্যাঙ, ফড়িং ও সাপ।

এই খাদ্য-খাদক সম্পর্কগুলোকে এক-একটি রেখা দিয়ে দেখানো হয়। এই রেখার সংখ্যা যত বেশি, ইকোসিস্টেমের জটিলতা তত বেশি। তলের সংখ্যা ও সর্বভূক প্রাণীর সংখ্যা বাড়লেও জটিলতা আরও বাড়ে। আর যে ইকোসিস্টেম যত বেশি জটিল, তার স্থায়িত্ব ও ঘাতসহতা তত বেশি।[১৭] রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের ফলে অনেক প্রজাতি ইকোসিষ্টেম থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় বিধায় ইকোসিষ্টেম অনেক সরল হয়ে পড়ে।

৩. কৃষি-ইকোসিষ্টেমে পারষ্পরিক সম্পর্ক

একটি ইকোসিষ্টেমে উপস্থিত জীববৈচিত্র্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান যেমন:খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, পারষ্পরিক সহযোগিতা সম্পর্ক, পরজীবী-পোষক সম্পর্ক ও প্রতিযোগিতা সম্পর্ক।

উপরের ছবিতে (চিত্র ৪) খাদ্য-খাদক সম্পর্কের জটিলতা দেখানো হয়েছে। ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এ সম্পর্ক বিদ্যমান।

ক. পারষ্পরিক সহযোগিতা সম্পর্ক

বিভিন্ন ফসলের ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। প্রজাপতি, মথ, মৌমাছি, বোলতা, ভ্রমর, জাবপোকা, মৌটুসি পাখি, বাদুড়- এরা না থাকলে বিভিন্ন উদ্ভিদের ফল ধরে না। ঢেঁড়স, পেঁয়াজ, সরষে, ধনেপাতা এদের পরাগ সংযোগ ঘটায় মৌমাছি। পেঁপের পরাগ সংযোগ ঘটায় একটি বিশেষ

প্রজাতির মথ ও তিন প্রজাতির প্রজাপতি। পেয়ারার পরাগ সংযোগ ঘটায় বাদুড় ও এক জাতের মৌমাছি যারা চাক বাঁধে না। খেজুর, ডুমুর, আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটায় বাদুড়। এ ধরনের সম্পর্কে পরাগসংযোগকারী প্রাণীরা উদ্ভিদের উপকার করে, আর ঐ উদ্ভিদ ফুলের মধু ও রেণু উপহার দেয় বন্ধু প্রাণীদের। এই সম্পর্ককে বলে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক (চিত্র ৫ ও ৬)।

সরিষা

পেয়াজ

চিত্র ৫: সরিষা ও পেয়াজে মৌমাছির মাধ্যমে পরাগায়ন

কলা

মিষ্টিকুমড়া

চিত্র ৬: কলার ফুলে বাদুড় ও মিষ্টিকুমড়ার ফুলে মৌমাছির মাধ্যমে পরাগায়ন

খ. প্রতিযোগিতার সম্পর্ক

পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কের ঠিক উল্টো সম্পর্ক হল প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, যাতে দুই প্রজাতির জীব একে অপরের ক্ষতি করে, নিজের বেড়ে ওঠার জন্য। মুথা ঘাস আর ধান গাছ, এরকম দুই প্রতিযোগী (চিত্র ৭)।

চিত্র ৭: ধান গাছ ও মুথা ঘাসের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক
সূত্র: www.researchgate.net/publication/272092546

গ. পরজীবী-পোষক সম্পর্ক

রোগ সংক্রমণকারী জীবাণু বা ছত্রাকরা, নির্দিস্ট কিছু পোষক (প্রাণী বা উদ্ভিদ) এর পরজীবী। ঐ প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষতি করে জীবাণু বা ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি ঘটে (চিত্র ৮)।

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা টমেটোর উইল্ট বা ঢলেপড়া রোগ

ভাইরাস দ্বারা বরবটির মোজাইক রোগ

চিত্র ৮: পরজীবী-পোষক সম্পর্ক

সারণি ২: বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক	+	+
খাদ্য-খাদক সম্পর্ক	−	+
পরজীবী-পোষক সম্পর্ক	+	-
প্রতিযোগিতা সম্পর্ক	-	-

'+': উপকার; '-': অপকার

সারণী ৩: প্রজাতি 'ক' ও প্রজাতি 'খ' এর মধ্যে পারষ্পরিক সম্পর্ক

সম্পর্ক	প্রজাতি 'ক'	প্রজাতি 'খ'	সম্পর্কের ধরন
পারস্পরিক সহযোগিতা	(+) সরিষা ফুল	(+) মৌমাছি	উভয়ই উপকৃত হয়
খাদ্য-খাদক	(−) মাজরা পোকা	(+) ব্যাঙ	খাদ্য বিলীন বা শেষ হয়, খাদক উপকৃত হয়
পরজীবী-পোষক	(+) ভাইরাস (+) ছত্রাক	(-) ধান বা সবজি (-) ধান বা সবজি	পরজীবী উপকৃত হয়, পোষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়
প্রতিযোগিতা	(-) ধান	(-) মুথা ঘাস	প্রত্যেকের ক্ষতি হয়

এই সমস্ত রকমের সম্পর্কগুলো একটি সাধারণ ছবিতে দেখানো দুস্কর। কিন্তু এত রকমের সম্পর্ক একত্রে একটি স্বাভাবিক ইকোসিস্টেমে থাকে বলে, সেটা অত্যন্ত জটিল। রাসায়নিক নির্ভর কৃষিতে বহু সংখ্যক প্রজাতি কৃষি-ইকোসিস্টেম থেকে অপসৃত হয়ে যায়, ফলে অনেক রকমের সম্পর্কসূত্রগুলো লুপ্ত হয়ে যায়। তাতে ঐ ইকোসিস্টেম অনেক সরল হয়ে পড়ে, এবং অনেকগুলো তলের জায়গায় মাত্র দুটি বা তিনটি তল পড়ে থাকে। অর্থাৎ, প্রজাতির সংখ্যা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইকোসিস্টেমও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

৪. কৃষি-ইকোসিস্টেমের সমৃদ্ধতা ও জটিলতা বৃদ্ধির উপায়

চাষের ক্ষেতে যত বেশি প্রজাতি এবং শস্যের যত বেশি জাত থাকে, কৃষি-ইকোসিস্টেম তত সমৃদ্ধ। বিভিন্ন রকমের পোকা ও পাখিদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য, চাষের ক্ষেতের গঠনকে এমনভাবে তৈরি করা যায়, যাতে তারা আমন্ত্রিত হয়। ক্ষেতে বড় আম বা মহুয়া গাছ থাকলে, গিরগিটি, পাখি, মৌমাছি, বোলতা, নালসো পিঁপড়া ইত্যাদি প্রাণী তাতে বাসা করতে আসে। তাল গাছ থাকলে বাবুই পাখি (চিত্র ৯), বাদুড় ও গন্ধগোকুল আসে। বড় ঝোপ থাকলে সাপ, গিরগিটি, ব্যাঙ, গুবরে পোকা জাতীয় অজস্র পোকা ও মাকড়সা বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

ক্ষেতের জমিতে মধ্যে-মধ্যে ছোট-ছোট গর্ত থাকলে তাতে জল জমে ব্যাঙাচি ও নানা রকম জলপোকার আস্তানা হয়। এরা ফসলের অনেক শত্রু পোকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। পানিলং (*Ludwigia decurrens*) গুল্ম ধানক্ষেতে থাকলে একটি বিশেষ প্রজাতির কাঁচপোকা (*Altica cyanea*) আসে, যারা ঐ গুল্মের ফুল খেয়ে ফেলে (চিত্র ১০)। মরে যাওয়ার পর পানিলং-এর শরীর থেকে তৈরি পটাশিয়াম ও ফসফরাস জমিকে উর্বর করে।

চিত্র ৯: তালগাছে বাবুই পাখির বাসা

পানিলং

কাঁচপোকা

চিত্র ১০: পানিলং ও কাঁচপোকা

জমিতে দূর্বা ঘাস থাকলে, মুথা ঘাসের (*Cyperus rotundus*) সংখ্যা অনেক কমে যায় (চিত্র ১১)। জমির মাটি শুকনো থাকলে, উইপোকা মাটির নিচ থেকে উঠে আসে। এদের নিয়ন্ত্রণ করতে কালো ডেঁয়ো পিঁপড়া খুব কার্যকরী। বুদ্ধিমান কৃষক কালো ডেঁয়ো পিঁপড়া নিজের জমিতে নিয়ে আসেন।

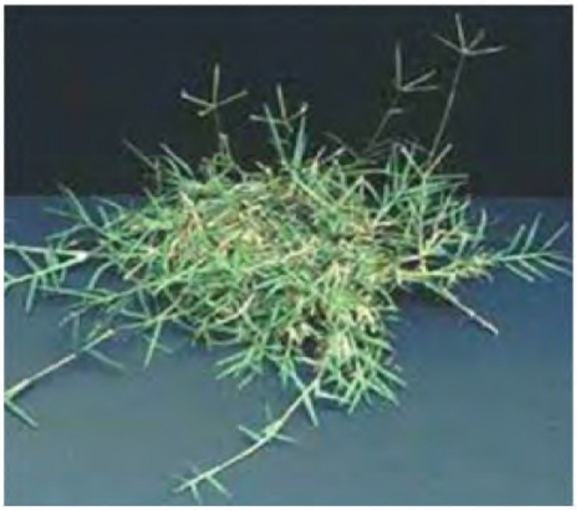

দূর্বা ঘাস

মুথা ঘাস

চিত্র ১১: দূর্বা ঘাস মুথা ঘাসকে নিয়ন্ত্রণ করে

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী চাষীরা একই জমিতে বিশ থেকে পঁচিশ রকমের ধান, ছয় থেকে আট রকম বাজরা, তিন থেকে পাঁচ রকমের ডাল শস্য চাষ করেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, অ-শস্য উদ্ভিদ ও শস্যের বৈচিত্র্য কৃষি-ইকোসিস্টেমকে সমৃদ্ধ করে। আর তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিরাট সংখ্যা এই ইকোসিস্টেমকে খুব জটিল করে তুলে ঘাতসহ করে দেয়। বিভিন্ন শস্যের ও অ-শস্য উদ্ভিদের মিশ্র চাষের পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করা হবে পঞ্চম অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

মাটি ব্যবস্থাপনা

১. মাটির সংরক্ষণ ও উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়

ক. মাটির শ্রেণী

বাংলাদেশে চার ধরনের মাটি পাওয়া যায়, যথাঃ বেলে, এঁটেল, দোআঁশ ও পলি মাটি (চিত্র ১২)। বালি, কাদা ও পলির অনুপাত অনুযায়ী মাটি বেলে-দোআঁশ, বেলে-এঁটেল বা এঁটেল-দোআঁশ ইত্যাদি হতে পারে।

বেলে মাটি

এঁটেল মাটি

দোআঁশ

পলি মাটি

চিত্র ১২: বিভিন্ন ধরনের মাটি

খ. মাটি পরীক্ষা

মাটির চরিত্র বোঝার জন্য, একটি স্বচ্ছ বোতল বা গ্লাসে মাটির নমুনা পানিতে গুলে খুব ভাল করে ঝাঁকিয়ে ৪-৫ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। তারপরে দেখা যাবে, কয়টি স্তর পাওয়া গেছে (চিত্র ১৩)। বালি, কাদা ও পলির স্তরের উচ্চতা মাপলে, এই উপাদানগুলোর অনুপাত পাওয়া যাবে (চিত্র ১৪)। সেই অনুযায়ী মাটির প্রকৃতি বোঝা যাবে।

চিত্র ১৩: জার পরীক্ষার মাধ্যমে মাটির প্রকার নির্ণয়

চিত্র ১৪: সচ্ছ বোতলে মাটি পরীক্ষা

সূত্র:www.small-farm-permaculture-and-sustainable-living.com/sustainable_soil_structure_management.html

ধান এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ শস্যের চাষের জন্য দোআঁশ মাটি আদর্শ। এতে পুষ্টিগুণ সর্বাধিক পরিমাণ থাকে। বেলে মাটিতে পানি সবচেয়ে সহজে প্রবেশ করে, আর এঁটেল মাটিতে পানি তুলনায় কম প্রবেশ করে। দোআঁশ মাটিতে বালি এবং পলির পরিমাণ প্রায় সমান থাকে বলে এর পানি-ধারণ ক্ষমতা বেশি। শুকনো অবস্থায় বেলে মাটি চাপ দিলে ঝুরঝুরে হয়ে যায়, দোআঁশ মাটি স্পঞ্জের মত নমনীয় হয়। আর এঁটেল মাটি শুকনো অবস্থায় খুব শক্ত থাকে।

গ. মাটির ক্ষয় ও চরিত্র বদল

জমিতে বহু বছর ধরে অবিরত চাষ করলে, মাটির উপরিস্তর ক্রমশ ক্ষয় হতে থাকে। বৃষ্টির পানিতে ক্রমশ এই উপরিস্তরের মাটি ধুয়ে বেরিয়ে যায় এবং নিচের স্তরের মাটি প্রকাশ্য হয়। পানিতে দ্রবীভূত হয়ে, বিশেষত মাটির পলি অংশটি বেরিয়ে যায় এবং প্রতিরোধক ব্যবস্থা না নিলে মাটিতে বালির ভাগ বাড়তে থাকে। বেলে-দোআঁশ জাতীয় মাটি ক্ষয় হতে হতে ক্রমশ দোআঁশ-বেলে আর তারপর বেলে মাটিতে পরিণত হয়।

ঘ. ভূমিক্ষয় রোধের উপায়

বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস, গুল্ম ও বৃক্ষের শিকড় ভূমিক্ষয় রোধ করে। বোরোচেইচ্ (*Cyperus irria*), ছাগলাগাছা (*Ageratim conyzoides*) (চিত্র ১৫), কাকপায়া (*Dactylocteniumaegyptium*), চাপড়া (*Eleusineindica*) (চিত্র ১৬) ইত্যাদি ঘাস এবং লজ্জাবতী লতা, ঘাগরা (*Xanthiumindicum*), কাঁটা বেগুন (চিত্র ১৭) ইত্যাদি গুল্মের শেকড় ভুমিক্ষয় রোধে সাহায্য করে। চাষের ক্ষেতে এসব উদ্ভিদ থাকলে বৃষ্টির পানিতে মাটি ধুয়ে যাবে না। এর সঙ্গে জাবড়া (পাতা বা খড় দিয়ে মাটি ঢেকে দেওয়া) একটি কার্যকরী পদ্ধতি (চিত্র ১৮)।

বোরোচেইচ

ছাগলাগাছা

চিত্র ১৫: বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস যারা ভূমিক্ষয় রোধ করে

কাকপায়া

চাপড়া

চিত্র ১৬: বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস যারা ভূমিক্ষয় রোধ করে

লজ্জাবতী

ঘাগরা

কাঁটা বেগুন

চিত্র ১৭: ভূমিক্ষয় রোধ করে এমন গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ

চিত্র ১৮: সবজি ক্ষেতে খড়ের জাবড়া প্রয়োগ

ঙ. মাটির উর্বরতা

উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য যে খাদ্যবস্তুগুলোর প্রয়োজন তার মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম প্রধান। এদেরকে মুখ্য পুষ্টি উপাদান বলে। এছাড়া বিভিন্ন মৌল যেমনঃ ম্যাঙ্গানিজ, তামা, বোরন, দস্তা, ক্যালসিয়াম, সালফার ইত্যাদি গৌণ পুষ্টি উপাদানও উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। এই পুষ্টি উপাদানগুলো মাটিতে জটিল যৌগ হিসেবে উপস্থিত থাকে। এদের উদ্ভিদের শেকড়ের শোষণের উপযোগী করে তুলতে অজস্র জীবের উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। কেঁচো, কেন্নো, সিউডোস্করপিয়ন (চিত্র ১৯), গুবরে পোকা ও তাদের শুককীট ও বিভিন্ন অনুজীব মাটির মধ্যেকার বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থ ও জটিল অদ্রাব্য রাসায়নিক যৌগকে ভেঙে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি করে দেয়। সুতরাং যে মাটিতে এসব প্রাণী নেই সেই মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

কেঁচো

কেন্নো

সিউডোস্করপিয়ন

চিত্র ১৯: মাটিতে বসবাসকারী প্রাণী যারা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে

মাটিতে বসবাসকারী অনুজীবের মধ্যে ছত্রাক *(ছ)* ও জীবাণুর *(জ)* ওজনের অনুপাত দেখে কৃষি জমির মাটির উর্বরতার মাত্রা অনুমাণ করা যায়। যেমন: *ছ/জ* = ১ হলে, মাটি যথেষ্ট উর্বর। *ছ/জ* = ১ এর কম হলে, মাটির উর্বরতা বেশি। *ছ/জ* = ১ এর অধিক হলে, মাটির উর্বরতা কম; এধরনের মাটিকে উল্টে-পাল্টে জীবাণু সার দিয়ে উর্বরতা স্বাভাবিক মাত্রায় আনা দরকার। ল্যাবরেটরীতে মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে এটা করা যায়।

ফসল তোলার পর মাটির পৌষ্টিক উপাদানের অনেকটাই কমে যায়। পুষ্টির এই ঘাটতি পূরণের জন্য জৈব সার নিয়মিত দেওয়া আবশ্যক। জৈব সার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন,

অ) পুরনো গোবর ও প্রাণীজ মল
আ) হাড়ের গুড়ো
ই) গোমূত্র
ঈ) সরষে, তিল, তিসি ও নিমের খৈল
উ) শুকনো কম্পোস্ট
ঊ) তরল কম্পোস্ট
ঋ) স্তরায়িত কম্পোস্ট
এ) জীবাণু সার (পি. এস. এম., নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী ব্যাকটেরিয়া)
ঐ) পাতা সার।

চ. উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যউপাদান বা পুষ্টিউপাদান

উদ্ভিদের বেঁচে থাকা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া এবং বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে ফুল, ফল এবং বীজ উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত মৌলিক উপাদান অপরিহার্য, তাদেরকেই উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক খাদ্যউপাদান বা পুষ্টিউপাদান বলে। এর সংখ্যা ১৬ টি। এদের যে কোন উপাদানের পূর্ণ অভাব হলে উদ্ভিদ মারা যাবে এবং ঘাটতি হলে আনুপাতিক হারে উদ্ভিদের দেহ ক্রিয়ায় কোথাও না কোথাও ব্যাঘাত ঘটবে, যা সুনির্দিষ্ট লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। উদ্ভিদ অত্যাবশ্যক খাদ্যউপাদানের কিছু সংখ্যক বেশী এবং কিছু সংখ্যক কম পরিমাণে

পরিশোষণ করে। তাই পরিশোষণের পরিমাণের ভিত্তিতে খাদ্যউপাদান দু'প্রকার–মুখ্য খাদ্যউপাদান ও গৌণ খাদ্যউপাদান।

অ. মূখ্য খাদ্যউপাদান

মূখ্য খাদ্যউপাদান ৯ টি, যথাঃ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, সালফার, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। এ সমস্ত পুষ্টিউপাদান উদ্ভিদের জন্য বেশী পরিমাণে প্রয়োজন।

আ. গৌণ খাদ্যউপাদান

গৌণ খাদ্যউপাদান ৭ টি যথা: কপার, জিংক, বোরন, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম ও ক্লোরিন। এ সমস্ত পুষ্টিউপাদান উদ্ভিদের জন্য কম পরিমাণে প্রয়োজন।

উদ্ভিদ বেঁচে থাকা বা জীবনধারণের জন্য আবশ্যক পুষ্টিউপাদানসমূহ মাটি থেকে গ্রহণ করে। যদি মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুষ্টিউপাদান না থাকে তাহলে বাইরে থেকে সার হিসাবে দেওয়া হয়। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি কাজে জৈব সার ব্যবহার করা হয়। এর জন্য প্রতিটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের জন্য সুপারিশকৃত সারের পরিমাণের সাথে তুলনা করে জৈব সারের পরিমান (সারণি ৫) হিসাব করে শুধুমাত্র জৈব সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে গাছ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টিউপাদান মাটি থেকে গ্রহণ করতে পারবে।

সারণি ৪: বিভিন্ন জৈব সারে পুষ্টিউপাদানের শতকরা হার

সারের নাম	আর্দ্রতা (%)	নাইট্রোজেন (%)	ফসফরাস (%)	পটাশিয়াম (%)	সালফার (%)
গোবর (তাজা)	৬০	০.৫	০.১৫	০.৫	
গোবর (পঁচা)	৩৫	১.২	১.০	১.৬	০.১৩
ফার্ম ইয়ার্ড সার (ফার্মে তৈরি সার)	৬৭	১.৬	০.৮৩	১.৭	০.৫৬
পোল্ট্রি সার	৫৫	১.৯	০.৫৬	০.৭৫	১.১
কম্পোষ্ট	৪০	০.৭৫	০.৬	১.০	-
কম্পোষ্ট (কচুরিপানা)	৭০	১.৫	০৮	৩.০	-
সরিষার খৈল	১৫	৫.০	১.৮	১.২	-
তিসির খৈল	১৫	৫.৫	১.৪	১.২	
তিলের খৈল	১৫	৬.২	২.০	১.২	
বাদামের খৈল	-	৭.০	১.৫	১.৩	-
হাড়ের গুড়ো (কাঁচা)	৮	৩.৫	৯	-	-
হাড়ের গুড়ো (সিদ্ধ)	৭	১.৫	১০		-
মাছের গুড়ো	১০	৭	৩.৫	১.০	-

সূত্রঃ সার সুপরিশকৃত গাইড, ২০০৫, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)

প্রাণীজ বর্জ্য থেকে যে সার হয় তাতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস বেশি থাকে। গোমূত্রে নাইট্রোজেনের সঙ্গে বেশ কিছু উদ্ভিদ হরমোন-উদ্দীপক বস্তু থাকে। হাড়ের গুড়োতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বেশি থাকে। তৈল বীজের খৈল থেকে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। কম্পোস্ট সার মূলত প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তু পচিয়ে তৈরি করা হয়।

ছ. জীবাণু সার

নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ

মাটিতে স্বাভাবিকভাবে অজস্র জীবাণু থাকে যারা বাতাসের নাইট্রোজেন এবং মাটির মধ্যেকার নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ থেকে দ্রবণীয় অবস্থায় নাইট্রোজেনকে নিস্কাশন করে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি করে দেয়। এদের নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবানু বলা হয়। এরা না থাকলে নাইট্রোজেন সার মাটিতে দিলেও উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারেনা।

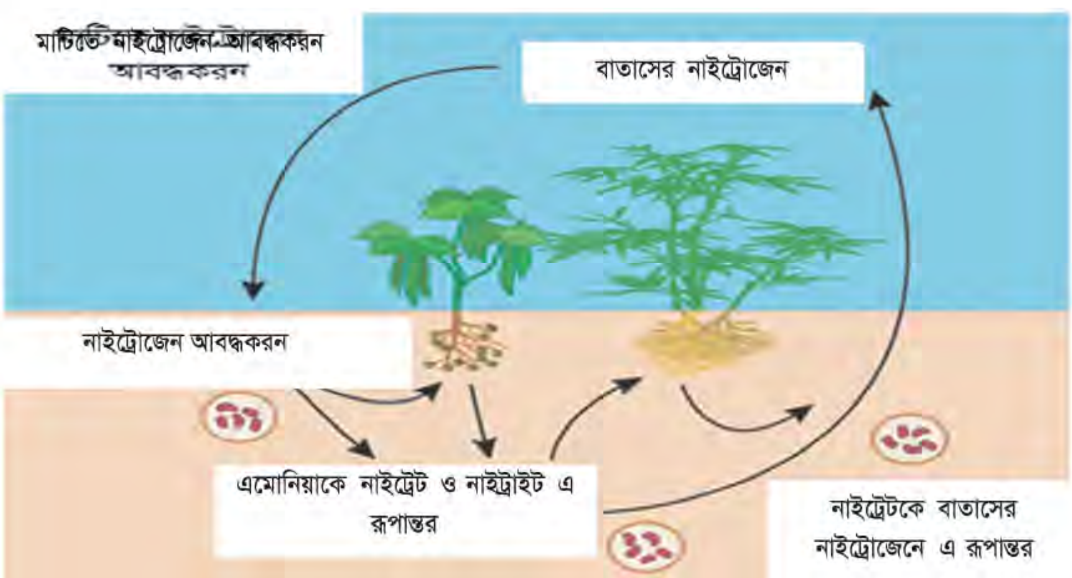

চিত্র ২০: মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ

বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেন অনু (N_2) হিসাবে থাকে। এই নাইট্রোজেন গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। মাটিতে বসবাসকারী অনুজীব নাইট্রোজেন চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাটিতে মুক্তভাবে বসবাসকারী অনুজীব (ব্যকটেরিয়া ও প্রোক্যারিওট) নাইট্রোজেন অনুকে এমোনিয়াতে রূপান্তর করে যা গাছ গ্রহণ করতে পারে। এই এমোনিয়া থেকে ব্যকটেরিয়ার মাধ্যমে নাইট্রাইট ও নাইট্রেট এ রূপান্তরিত হয় (চিত্র ২০)। গাছ এই নাইট্রোজেন জৈব উপাদান তৈরিতে কাজে লাগায়। নাইট্রোজেন ধারণকারী এই মলিকুল প্রাণীদের দেহে যায় যখন এরা গাছকে খাবার হিসাবে গ্রহণ করে। এই মলিকুল প্রাণীদেরও দেহে অন্তর্ভুক্ত হয় আর কিছু পরিমাণ ভেঙ্গে মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নিঃসৃত হয়। নাইট্রোজেন জীবের দেহে চিরতরে থেকে যায়না। এই জৈব নাইট্রোজেন পুনরায় ব্যকটেরিয়ার মাধ্যমে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনে

রূপান্তরিত হয়। জীব মারা গেলে তার দেহের নাইট্রোজেন যৌগ ব্যকটেরিয়া দ্বারা পুনরায় এমোনিয়াতে রূপান্তরিত হয়। এই এমোনিয়া নাইট্রাইট ও নাইট্রেট এ রূপান্তরিত হয়। উৎপাদিত নাইট্রেট ডিনাইট্রিফায়িং অনুজীবের মাধ্যমে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়ে বাতাসে চলে যায়। জমিতে ডাল জাতীয় শস্য যেমনঃ বরবটি, সয়াবীন (চিত্র ২১), মটরশুটি, মাসকালাই ও ছোলা (চিত্র ২২) চাষের মাধ্যমে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ হয়।

বরবটি

সয়াবিন

শিকড়ে নডিউল

চিত্র ২১: নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গাছের শিকড়ে নডিউল তৈরি করে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ করা যায়

মটরশুটি

মাসকালাই

ছোলা

চিত্র ২২: ডাল জাতীয় শস্য

ফসফরাস আবদ্ধকরণ

এরকম আরেক ধরনের জীবাণু মাটিতে থাকে, যারা অদ্রবণীয় ফসফরাস ঘটিত পদার্থকে বিশ্লেষণ করে উদ্ভিদের দ্রবণীয় পুষ্টিযোগ্য ফসফরাস পদার্থে রূপান্তর করে। মাটির ফসফরাসকে দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করতে পারে বিশেষ কিছু জীবাণু ও ছত্রাক। এই ছত্রাকদের 'মাইসেলিয়াম' উদ্ভিদের শেকড়ের অগ্রভাগে যুক্ত হয়ে উদ্ভিদের শেকড়ে ফসফরাস পৌঁছে দেয়। ধান, জোয়ার, পেঁপে, কচু, ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদের শেকড়ে এই ছত্রাক প্রচুর পরিমাণে সংযুক্ত থাকে। এই ধরণের ছত্রাক ও জীবাণুদের বলা হয় 'ফসফরাস দ্রবীকরণী অনুজীব' (পি. এস. এম.), যাদের মাটিতে প্রয়োগ করলে মাটিতে উদ্ভিদের শোষণযোগ্য ফসফরাসের ঘাটতি কমে যায়।

জ. পাতা সার

বিভিন্ন গাছের ঝরে পড়া পাতা ও বিভিন্ন ঝোপঝাড় থেকে সংগৃহীত সবুজ পাতা, শস্যক্ষেতের উপরে বিছিয়ে দিলে মাটির উপর আচ্ছাদন হিসেবে কাজ করে, যাতে মাটির ভেতরের ধরে রাখা পানি রোদের তাপে উবে যায়না। মাটি শীতল থাকে, ফলে মাটির ভেতরের বাসিন্দা কেঁচো, কেন্নো, পোকা-মাকড় এবং অনুজীব আরামে থাকতে পারে। এই পাতাগুলো কিছুদিন পর ছত্রাক ও জীবাণু দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে মাটিতে নাইট্রোজেন ও পটাশিয়াম যোগ করে। অর্থাৎ সবুজ পাতা আর ঝরে পড়া শুকনো পাতা দুইই সার হিসেবে কাজ করে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ইউক্যালিপটাস ও আকাশমনির (চিত্র ২৩) পাতা যেন কোনভাবেই জমিতে না পড়ে, কারণ এদের পাতা পচানোর মত অনুজীব মাটিতে নেই।

ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus globules)

আকাশমনি (Acacia auriculiformis)

চিত্র ২৩: ইউক্যালিপটাস ও আকাশমনি উদ্ভিদ

বিভিন্ন ধরনের সার তৈরির পদ্ধতি

কম্পোষ্ট সার

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের জমির উপযোগী কয়েকটি কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি এখানে দেয়া হল।

শুকনো কম্পোস্ট:

তরকারীর খোসা, পাতা, খড়, মাছের কাঁটা ও আঁশ, মাংসের ছাঁট ইত্যাদি মাটির উপরে খোলা বাতাসে রেখে দিলে বিভিন্ন জীবাণুর ক্রিয়ায় কিছুদিন (গড়ে ৩০ দিন) পর শুকনো কম্পোস্টে পরিণত হয়। এই কম্পোস্ট মাটির উপরে স্তুপ করে রেখে দিতে হয়। বৃষ্টির পানি যাতে না পড়ে তার জন্য উপরে একটি চালা করে দিতে হবে।

বাতাস চলাচল করতে পারে এমন খোলা ড্রামে বা বাক্সে উদ্ভিজ্জ বর্জ্য পদার্থ স্তরে স্তরে রেখেও পচানো যায় (চিত্র ২৪)। এধরনের কম্পোস্টে প্রাণীর শরীরের অংশ (মাছের কাঁটা ও আঁশ, মাংসের ছাঁট ইত্যাদি) না দিলে ভাল হয়। একবারে উপরের স্তরে কিছুটা পচা গোবর বা তৈরি কম্পোস্ট রেখে দিলে সার দ্রুত তৈরি হবে। মাঝের কয়েকটি স্তরে ফেলে দেয়া কাগজের টুকরো, কাঠের টুকরো দিয়ে রাখলে বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে। এছাড়া ড্রামে বা বাক্সের দেওয়ালে কয়েকটি ছিদ্র করে দিতে হবে।

৬- ৭ দিন পরপর একটি লাঠি দিয়ে কম্পোস্টের মধ্যে গর্ত করে নেড়ে দিতে হবে। যখন পচা গন্ধ আর পাওয়া যাবে না, তখন বোঝা যাবে কম্পোস্ট তৈরি হয়ে গেছে। এই শুকনো কম্পোস্ট খুব দ্রুত তৈরি হয়ে যায় এবং দূর্গন্ধ ছড়ায় না।

তরল কম্পোস্ট:

ঐ একই উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বস্তু মাটির নিচে বা বদ্ধ পাত্রে পানিতে রেখে পচিয়ে তরল কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। এই মিশ্রনে পুরনো গোবর বা মল কিছুটা দিয়ে পচন প্রক্রিয়া দ্রুত চালু করা যায়। গোবর গ্যাস প্লান্ট থেকে গোবর পচনের পর যে কালো তরল (স্লারি) পাওয়া যায়, বস্তুত সেটিও একটি তরল কম্পোষ্ট। যে খামারে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে, সেখানে তরল কম্পোষ্ট সহজে ব্যবহার করা যায়।

গোমূত্র কিছুটা বেশি পরিমাণে যোগ করলে তরল কম্পোস্টের কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়। যখন কম্পোস্ট থেকে পচা গন্ধ আর পাওয়া যাবে না, তখন বোঝা যাবে কম্পোস্ট তৈরি হয়ে গেছে।

চিত্র ২৪: ড্রামে শুকনো কম্পোষ্ট

চিত্র ২৫: তরল কম্পোষ্ট

স্তরায়িত কম্পোস্ট:

মাটির উপরে খোলা জায়গায় শক্ত বেদীর উপরে গোবরের স্তর (কমপক্ষে ৩ ইঞ্চি) বিছিয়ে দিতে হবে। তার উপরে উদ্ভিজ্জ বস্তু (পাতা, খড়, তরকারীর খোসা ইত্যাদি) কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিতে হবে (চিত্র ২৭)। তারপর আবার ৬ ইঞ্চি পুরু গোবরের স্তর - এইভাবে ৪ বা তার চেয়ে বেশি স্তর বিছিয়ে দিয়ে একেবারে উপরে কিছু খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা করতে এই ঢিবিটির উপর একটি আচ্ছাদন দিয়ে দিতে হবে। ১৫- ২০ দিন পর পর একটি লাঠি দিয়ে ঢিবিটির উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ২- ৩ টি গর্ত করে দিতে হবে। দুই মাস পর কম্পোস্ট তৈরি হয়ে যাবে।

কম্পোস্ট-এর খানিকটা নমুনা নিয়ে তাতে পানি মেশালে যখন সোঁদা গন্ধ পাওয়া যাবে, তখন বোঝা যাবে স্তরায়িত কম্পোস্ট তৈরি হয়ে গেছে।

চিত্র ২৬: স্তরায়িত কম্পোস্ট

ভার্মিকম্পোস্ট:

যে মাটিতে বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগের ফলে কেঁচো লুপ্ত হয়ে গেছে সেখানে কেঁচোর শরীর থেকে উৎপাদিত সারবস্তু মাটিতে দেয়ার জন্য ভার্মিকম্পোস্ট করা হয়। একটি কাঠের বাক্স বা মাটির পাত্র বা সিমেন্টের চৌবাচ্চাতে কিছু মাটি ও উদ্ভিজ্জ বর্জ্য রেখে তাতে কিছু সংখ্যক কেঁচো পালন করা হয়। এই মাটি ও বর্জ্য কেঁচো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মাটির সঙ্গে কিছুটা গোবর দিলে মাটির মধ্যেকার অনেক জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাতে কেঁচো খাদ্যের পরিমাণ বেড়ে যায়। প্রথমবার ব্যবহারযোগ্য সার তৈরি হতে প্রায় ৩ মাস লাগে, তবে কেঁচোর সংখ্যা পাত্রের আয়তনের অনুপাতে যত বেশি হবে সার তত দ্রুত তৈরি হবে। বৃষ্টির পানি যাতে না পড়ে তার জন্য উপরে একটি চালা করে দিতে হবে (চিত্র ২৭)। যদি ঘরের মধ্যে সার তৈরি করা হয় তাহলে সে সমস্যা নেই। তবে প্রতি সপ্তাহে কম্পোস্টে কিছু পানি ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে মাটি স্যাঁৎস্যাতে থাকে।

চিত্র ২৭: ভার্মিকম্পোস্ট

বাজারে যে কেঁচো ভার্মিকম্পোস্টের জন্য বিক্রি হয় তা বিদেশী (ফিলিপাইনস, কেনিয়া, উগান্ডা, নাইজার দেশের)। তাই এই ধরনের কেঁচোর প্রজাতি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করানো অনুচিত। এদের তুলনায় স্থানীয় অজস্র প্রজাতির কেঁচো আছে যাদের কার্যকারিতা অনেকগুণ বেশি। দেশী কেঁচোর প্রজাতি ব্যবহার করে ভার্মিকম্পোস্ট করা যায়। কিন্তু আরও ভাল হয় যদি চাষের জমিতে স্থানীয় কেঁচো স্বাভাবিকভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে।

জীবাণু সার

ফসফরাস কালচার

কচু, ধান, ঘাস, লজ্জাবতীর শিকড়ে এক ধরনের ছত্রাক থাকে। এই ছত্রাক অদ্রবনীয় ফসফরাসকে দ্রবনীয় আকারে রূপান্তর করে যা গাছ সহজে গ্রহণ করতে পারে। এই ছত্রাকের মাইসেলিয়াম (চিত্র ২৮) মূলের ঠিক কাছাকাছি থাকে। আবার ডাল ও ধইঞ্চা ফসলের শিকড়ে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া নডিউল তৈরি করে বাতাসের নাইট্রোজেনকে মাটিতে আবদ্ধ করে গাছের গ্রহণোপযোগী আকারে নিয়ে আসে। এসব ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়াসমৃদ্ধ মাটিসহ গাছের শিকড় ভেঙ্গে মাটিতে বিছিয়ে দিতে হবে (চিত্র ২৯)। এর উপর গাছের সবুজপাতা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হবে (চিত্র ৩০)। পরপর তিন দিন হালকা পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

সাত দিন পর কাঠি দিয়ে পাতাসহ মাটিতে কতগুলো ফুটো করতে হবে। পাতার উপর কাঠ কয়লার গুড়ো ছিটিয়ে দিতে হবে (চিত্র ৩০)। একমাস পর নিচের মাটির রং সাধারণ মাটি থেকে আলাদা দেখাবে। পাতাগুলো সরিয়ে দিলে কাঠ কয়লাগুলো মাটির সংস্পর্শে আসবে এবং নতুন পাতা দিয়ে মাটিকে ঢেকে দিতে হবে। কাঠ কয়লায় অসংখ্য ছিদ্র থাকে যেখানে ছত্রাক বাসা তৈরী করবে। এই মিশ্রন আরও দশ দিন পর পুরো জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। এক বিঘা জমির জন্য আনুমানিক ১০ কেজি পরিমাণ ছিটাতে হবে। এর ফলে জমিতে টিএসপি/ডিএপি সার দেওয়ার প্রয়োজন হবেনা।

শুকনো সময় এই পদ্ধতিতে ফসফরাস সার তৈরি করতে হবে। প্রক্রিয়াটি শুরু করার পূর্বেই জায়গাটি প্রথমে পরিষ্কার করে মাটিতে চুন মিশিয়ে ৩-৪ দিন রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। নীচের ছবিতে ম্যানুয়াল তৈরীর পর্যায়ে ভারতের ড. দেবল দেব হাতে কলমে ফসফরাস কালচার প্রক্রিয়া অনুশীলন করাচ্ছেন।

চিত্র ২৮: অতশীকাঁচ দিয়ে মাইসেলিয়াম দেখে ছত্রাকের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হচ্ছে

চিত্র ২৯: ফসফরাস কালচার
(বামের ছবিঃ গাছ শিকড়মাটি সহ তুলে এনে গাছ কেটে আলাদা করা হচ্ছে।
ডানের ছবিঃ ছত্রাকের মাইসেলিয়াম সহ গাছের শিকড়মাটি মাটিতে ছড়ানো হচ্ছে)

চিত্র ৩০: ফসফরাস কালচার
(বামের ছবিঃ ছড়ানো মাটির উপর পাতা ছড়িয়ে দিয়ে পানি দেয়া হচ্ছে।
ডানের ছবি: পাতার উপর কাঠ কয়লার গুড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে)।

২. পানির সুষ্ঠু ব্যবহার

চাষের কাজে বিশেষত বোরো মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানি যথেচ্ছ তুলে সেচ দেওয়া হয় (চিত্র ৩১)। এর ফলে পানির ভান্ডার কমে যেয়ে পানির স্তর নিচে চলে যাচ্ছে এবং আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এর একমাত্র সমাধান ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা এবং সেচের জন্য পুকুর, নদী বা খালের পানি ব্যবহার করা (চিত্র ৩২, ৩৩ ও ৩৪)।

চিত্র ৩১: ভূগর্ভস্থ পানি সেচ (গভীর নলকূপ)

চিত্র ৩২: সেউতি দিয়ে ভূপৃষ্ঠের (খাল, বিল) পানির ব্যবহার

যে অঞ্চলে জলাশয় নেই অথবা জলাশয়ের পানি শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে যায় অথবা যেখানে জলাশয়ের পানি বিষাক্ত ও দূষিত হয়ে গেছে, সেখানে খরাসহনশীল শস্যের জাত চাষ করা যুক্তিযুক্ত।

চিত্র ৩৩ : বাঁশের মাধ্যমে নদী থেকে পানি সেচ
সূত্র:www.pinterest.com/pin/829295718853700216

চিত্র ৩৪ : ঝাঝরি দিয়ে পুকুর বা খাল থেকে পানি সেচ
সূত্র:www.desertification.wordpress.com/2016/04/29

সারণী ৫: বিভিন্ন মাত্রায় খরাসহনশীল শস্য

সাধারণ নাম	খরার মাত্রা	সাধারণ নাম	খরার মাত্রা
বরবটি	উচ্চ খরা সহ্যক্ষম	মিষ্টি আলু	স্বাভাবিক
ঢেড়ঁশ	স্বাভাবিক খরা সহ্যক্ষম	ডাটা	স্বাভাবিক
বেগুন	খরা সহ্যক্ষম	কলমি শাক	স্বাভাবিক খরা সহ্যক্ষম
ভূট্টা	স্বাভাবিক খরা সহ্যক্ষম	জোয়ার	উচ্চ খরা সহ্যক্ষম

বৃষ্টির পানি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধরে রাখার উপায় আছে (চিত্র ৩৫)। এই ধরে-রাখা বৃষ্টির পানি শুকনো মৌসুমে সেচ ও অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়, যাতে ভূগর্ভস্থ পানি তুলতে না হয়।

চিত্র ৩৫: পুকুর তৈরি করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায়
সূত্র:www.vanashree.in/rain_water_harvesting.htm

জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষের পদ্ধতি

১. শস্য বৈচিত্র্য বাড়িয়ে তোলবার বিভিন্ন পদ্ধতি

চাষের ক্ষেতে জীববৈচিত্র্য সম্ভার বাড়িয়ে তোলার জন্য শস্যের প্রজাতির সংখ্যা যথাসম্ভব বেশি রাখা প্রয়োজন। অনেক প্রজাতির শস্য একসঙ্গে একই জমিতে চাষ; পর্যায়ক্রমে একের পর এক বিভিন্ন প্রজাতির শস্যের চাষ; বিভিন্ন মৌসুমে একই প্রজাতির শস্যের চক্রাবর্তী চাষ, ও তার সঙ্গে বিভিন্ন শস্যের সঙ্গবদল; প্রতিটি শস্যের বিভিন্ন জাতের চাষ - এসবই শস্যবৈচিত্র্য বাড়িয়ে তোলে। শস্যের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি অ-শস্য উদ্ভিদের বৈচিত্র্যও প্রতি মৌসুমে যথাসম্ভব বেশি রাখা কাঙ্খিত।

প্রায় ১৫০০ বছর আগে উত্তর আমেরিকার আদিবাসী কৃষকরা শস্য বৈচিত্র্য বাড়ানোর একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, যার নাম 'তিন বোন চাষ'। এই পদ্ধতিতে ভুট্টা, স্কোয়াশ ও বীনের বীজ একসঙ্গে একই গর্তে ফেলা হয় (চিত্র ৩৬)। ভুট্টার কান্ড বেয়ে বীনের লতা ওঠে, আর স্কোয়াশ মাটিতে লতিয়ে বাড়তি ঘাসের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। স্কোয়াশের বড় বড় পাতা মাটির উপর আচ্ছাদন দিয়ে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখে। বীনের শেকড়ে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুরা তিনটি শস্যকেই নাইট্রোজেন যোগান দেয়।

চিত্র ৩৬: তিন বোন চাষ

ভারতে উত্তরাখন্ড রাজ্যের গাড়োয়াল প্রদেশে 'বারা-আনাজা' নামে একটি পদ্ধতিতে সাবেকী কৃষকরা চাষ করেন। এতে বার রকমের শস্য একত্রে চাষ করা হয়। প্রতিটি শস্যের একাধিক জাতও পাশাপাশি চাষ করা হয়। বিভিন্ন দেশে আদি কৃষকরা এই ধরনের শস্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধির নানান পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। নিচে এরকম শস্যবৈচিত্র্য বাড়িয়ে তোলবার কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

ক. অন্তর্বর্তী শস্য চাষ

দুই বা ততোধিক শস্য একসঙ্গে পাশাপাশি চাষ করলে তাকে অন্তর্বর্তী শস্য চাষ বলে। এধরনের চাষের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন শস্যের চাষ সবচেয়ে সহজ।

ক-১) একই জমিতে প্রতিটি শস্য আলাদা আলাদা সারিতে লাগিয়ে বিভিন্ন শস্যের চাষ করা যায়। যেমন, কলমিশাক, পুঁইশাক, বেগুন, মিষ্টিআলু শাক প্রভৃতি পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে লাগানো যায় (চিত্র ৩৭)।

কলমিশাক ঢেঁড়শ পুঁইশাক বেগুন মিষ্টি আলুশাক

চিত্র ৩৭: খরিপ মৌসুম উপযোগী একই জমিতে এক সাথে বিভিন্ন শস্য চাষের নমুনা

চিত্র ৩৭-এর মত করে খরিপ মৌসুমে একই জমিতে একই সময়ে পর পর সারি করে কলমিশাক, ঢেঁড়শ, পুঁইশাক, বেগুন, মিষ্টিআলুশাক ছাড়াও অন্যান্য ফসল চাষ করা যেতে পারে। এভাবে শস্য বৈচিত্র্য বাড়ানো সম্ভব। তবে ফসলের সারি করার সময় প্রতিটি ফসলের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে রোপন করতে হবে।

ডাঁটাশাক মিষ্টিকুমড়া টমেটো বরবটি আলু বাঁধাকপি

চিত্র ৩৮: রবি মৌসুম উপযোগী একই জমিতে এক সাথে বিভিন্ন ফসলের চাষ

চিত্র ৩৮-এর মতো করে রবি মৌসুমে এক জমিতে একই সময়ে পর পর সারি করে ডাঁটাশাক, মিষ্টিকুমড়া, টমেটো, বরবটি, আলু, বাঁধাকপি ছাড়াও অন্যান্য ফসল চাষ করা সম্ভব।

ক-২) প্রতিটি সারিতে একটি শস্যের বদলে দুই বা ততোধিক শস্য লাগালে শস্যবৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৩৯)। তবে একই পরিবারের সদস্য পাশাপাশি না রাখা ভাল। একই সারিতে একাধিক পরিবারের শস্য বপন করলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি শস্য প্রতিবেশী শস্যের শত্রু পোকা তাড়াবে। যেমনঃ ধনেপাতা ও রসুন।

এখানে শস্যের বিভিন্ন পরিবার সম্পর্কে একটা তালিকা তুলে ধরা হলো। এই তালিকা আরও সমৃদ্ধ করা যেতে পারে।

১. দানাশস্য পরিবারঃ ধান, গম, ভূট্টা, যব, জোয়ার, কাউন, বাজরা
২. কচু পরিবারঃ ওল, মেটে আলু, মান কচু, গুড়ি কচু, পঞ্চমুখী কচু, শোলা কচু, কালো কচু
৩. বেগুন পরিবারঃ বেগুন, টমেটো, আলু, মরিচ, ক্যাপসিকাম
৪. পেঁয়াজ পরিবারঃ পেঁয়াজ, রসুন
৫. বীট ও ডাটা পরিবারঃ বীট, লালশাক, ডাটা শাক (সাদানটে), পালং শাক, লেটুস, পুঁইশাক
৬. ডাল পরিবারঃ মসুর, মুগ, কলাই, অড়হর, শাকালু, বরবটি, শিম
৭. কুমড়া পরিবারঃ শশা, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, খিরাই, চাল কুমড়া, পটল, ঝিঙ্গা, কাকরোল
৮. চিচিঙ্গা
৯. কপি পরিবারঃ ফুলকপি, বাধাকপি, ব্রকোলি, ওলকপি, সরিষা, শালগম, মূলা
১০. ঢেঁড়স পরিবারঃ ঢেঁড়স, মেস্তা পাট, চুক ফল
১১. ধনে পরিবারঃ ধনে, গাজর, মৌরি
১২. আদা পরিবারঃ আদা, আমাদা, হলুদ

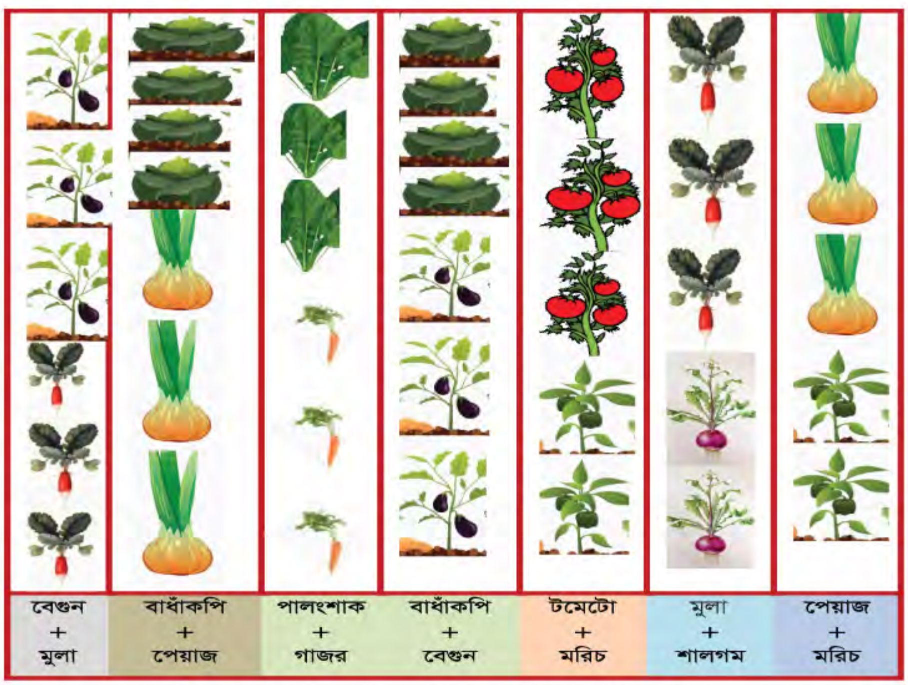

চিত্র ৩৯: প্রতিটি সারিতে দুইটি বা অধিক প্রজাতির ফসলের চাষ

বিভিন্ন শস্যের আন্তঃফসল চাষ

ভূট্টা ও লালশাক আন্তঃফসল

চিত্র ৪০: বিভিন্ন ফসলের মাধ্যমে আন্তঃফসল চাষ

ক-৩) যে অন্তর্বর্তী শস্যের চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবারের উদ্ভিদ পাশাপাশি থাকে সেই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ও সুস্থায়ী। একই সারিতে এবং পাশাপাশি সারিতে বিভিন্ন পরিবারের শস্য লাগালে কৃষি-ইকোসিস্টেমের জটিলতা সবচেয়ে বেশি হবে। যেমন, শিম ও ডাল জাতীয় শস্যের পাশাপাশি অন্য গোত্রের শস্য লাগাতে হবে, এতে শস্যের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাবে।

খ. পর্যায়ক্রমে বিবিধ শস্যের চাষ

তিলের পর ধান, তারপর সরষে, তারপর লাউ/কুমড়া, তারপর পাট - এভাবে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন শস্যের চাষের ফলে একই জমিতে শস্যবৈচিত্র্য বেড়ে যায়, তার সঙ্গে প্রতিটি শস্যের প্রজাতির সঙ্গী উদ্ভিদ, ছত্রাক, জীবাণু ও বিভিন্ন প্রাণী এককেটি মৌসুমে জমিতে এসে যায়। একটি মৌসুমে ক্ষেতের যে স্থানে একটি নির্দিষ্ট শস্য পরিবারের শস্য লাগানো হয়েছিল, পরবর্তী মৌসুমে ঠিক সেই স্থানে ঐ একই পরিবারের শস্য লাগানো অনুচিত।

আদিকাল থেকে অর্থাৎ যখন প্রথম চাষাবাদ শুরু হয় তখন থেকে কৃষক শস্য আবর্তন করে চাষ করে এবং এর জন্য অনেক কৌশলও ব্যবহার করা হয়। এর প্রভাব হিসাবে দেখা যাবে যদি আগের মৌসুমে টমেটো চাষ করা হয় তাহলে সেখানে টমেটো গাছ ও ফল পছন্দকারী পোকা ও রোগ জমিতে থেকে যাবে। যদি পরের মৌসুমে ঐ জমিতে গাজর বা পাতা জাতীয় সবজি চাষ করা হয় তবে জমিতে থেকে যাওয়া ঐ পোকা এবং রোগ এর জন্য বর্তমান ফসল উপযোগী নয় ফলে পোকাটি খাবরের জন্য অন্যত্র

চলে যাবে। এভাবে ফসলটি রক্ষা পাবে। শস্যাবর্তন বোঝার জন্য আমরা নিচের ফসল পর্যায়টি উদাহরণ হিসাবে দেখাতে পারি।

ডাল জাতীয় ফসল ⟶ পাতা জাতীয় ফসল ⟶ ফল জাতীয় ফসল ⟶ মুল জাতীয় ফসল

উপরের প্রবাহ চিত্রে ক্ষেতের বিভিন্ন ফসলকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তাদের পুষ্টি চাহিদার উপর ভিত্তি করে। যেমনঃ পাতা জাতীয় সবজির নাইট্রোজেন, ফল জাতীয় সবজির ফসফরাস, মুল জাতীয় সবজির পটাসিয়াম বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। ডাল জাতীয় ফসল মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে সহায়তা করে। এই পদ্ধতিতে যদি শেষ ফসল ডাল জাতীয় থাকে তাহলে সেখানে পরের মৌসুমে পাতা জাতীয় ফসল লাগাতে হবে (চিত্র ৪১)। কারণ ডাল শস্য মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে এবং পাতা ফসলের অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন দরকার। পরের মৌসুমে সেই জায়গায় ফল জাতীয় ফসল চাষ করতে হবে। কারণ এদের ফসফরাস দরকার এবং অধিক পরিমানে নাইট্রোজেন জমিতে থাকলে গাছে ফল নাও ধরতে পারে। পরের মৌসুমে সেই জমিতে মুল জাতীয় ফসল লাগাতে হবে। কারণ এদের পটাসিয়াম দরকার এবং ফল জাতীয় ফসলের তুলনায় কম নাইট্রোজেন প্রয়োজন। পরিশেষে, পরের মৌসুমে সেই জমিতে ডাল শস্য লাগাতে হবে। যাতে জমিতে পুনরায় নাইট্রোজেন আবদ্ধ হতে পারে। এটি ফসলের একটি সাধারণ পর্যায়ক্রম। বছরে একবার এ পর্যায়ক্রম অনুসরণ করতে পারলে অধিক ফসল তোলা সম্ভব।

বিভিন্ন শ্রেণীর শস্য এখানে তুলে ধরা হলোঃ

পাতাজাতীয় শস্যঃ লেটুস, পালংশাক, বাধাঁকপি, ব্রকলি, ফুলকপি।
ফল জাতীয় ফসলঃ টমেটো, শসা, মরিচ, বেগুন, স্কোয়াশ। ফুল ফোটা ও ফল ধারণের জন্য এদের ফসফরাস দরকার। কিন্তু, নাইট্রোজেন আধিক্যে শুধু পাতা তৈরি হতে পারে।
মুল ও কন্দ ফসলঃ পেয়াজ, রসুন, শালগম, গাজর, বীট ও মুলা।
ডাল ফসলঃ সীম, মটরশূটি।

গ. চক্রাবর্তী চাষ ও বিভিন্ন শস্যের সঙ্গবদল

আউশ ধানের সঙ্গে ঢেঁড়শ, লালশাক, ডাটাশাক (সাদা নটে), বেগুন, মরিচ ইত্যাদি লাগানো যায়। এসব শস্য তোলার পর আমন ধানের সঙ্গে বরবটি, অড়হর ডাল, ঝিঙ্গা ইত্যাদি লাগানো যায়। আমন ধান তোলার পর বোরো মৌসুমে ধানের সঙ্গে টমেটো, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, ধনেপাতা, পালংশাক ইত্যাদি লাগানো যায়। অর্থাৎ ধানের সঙ্গী শস্যরা প্রতিটি মৌসুমে বদলে যায়। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন অ-শস্য উদ্ভিদ ও পোকা- মাকড়ের সমাহারও প্রতিটি মৌসুমে বদলে যায়।

মৌসুম	জায়গা ১	জায়গা ২	জায়গা ৩	জায়গা ৪
মৌসুম ১	পাতা সবজি	ফলজাতীয়	মুলজাতীয়	ডালজাতীয়
মৌসুম২	ফলজাতীয়	মুলজাতীয়	ডালজাতীয়	পাতাসবজি
মৌসুম৩	মুলজাতীয়	ডালজাতীয়	পাতাসবজি	ফলজাতীয়
মৌসুম৪	ডালজাতীয়	ডালজাতীয়	ফলজাতীয়	মুলজাতীয়

চিত্র ৪১: একটি জমির চার স্থানে চার শ্রেণীর সবজি চাষ করা যায়

ঘ. শস্যের জাতের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি

ধান, বেগুন, পেঁয়াজ, লাউ, কুমড়া, মরিচ, ভূট্টা ইত্যাদি শস্যের বহুসংখ্যক জাত বাংলাদেশে আছে। কৃষিক্ষেতে এসব শস্যের বিভিন্ন জাতের সংখ্যা যথাসম্ভব বাড়ালে (চিত্র ৪২ ও ৪৩) রোগ ও পোকার উপদ্রব কম হয় এবং ফলনের স্থায়িত্ব বাড়ে।

চিত্র ৪২: বিভিন্ন জাতের ধান একই জমিতে চাষ

ছবি ৪৩: লাউয়ের বিভিন্ন জাতের ফলের বৈচিত্র্য

ঙ) বহুতলীয় মিশ্র চাষ

বিভিন্ন প্রজাতির শস্যের সঙ্গে ফলের গাছ, ফুলের গাছ এবং অ-শস্য গুল্ম ও বৃক্ষ এক সঙ্গে এমনভাবে লাগানো হয় যে চাষের ক্ষেতটি বহুতলবিশিষ্ট উদ্ভিদের সমাহার হয়ে যায় (চিত্র ৪৪ ও ৪৫)। একেবারে নিচের তলায় থাকে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ; তার উপর তলায় গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ; তার উপর তলায় পেঁপে, কলা ইত্যাদি ছোট গাছ; তার উপরে পেয়ারা, শ্যাওড়া ইত্যাদি গাছ এবং তার উপর তলায় আম, নিম, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি বড় বৃক্ষ। এই গাছগুলোর নিচে বিভিন্ন শস্যলতা (মেটে আলু, বরবটি, শিম প্রভৃতি) লাগানো হয়, যেগুলো গাছ বেয়ে ওঠে।

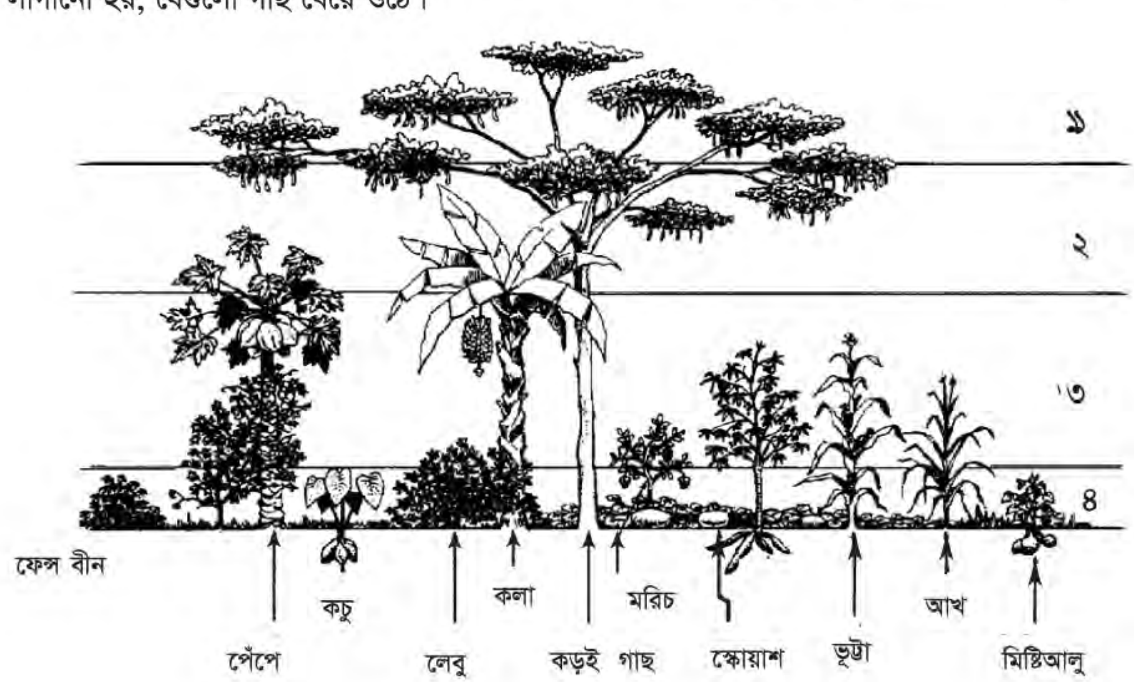

চিত্র ৪৪: বহুতলীয় মিশ্রচাষ

সূত্র:www.archive.unu.edu/unupress/food/8F073e/8F073E00.gif

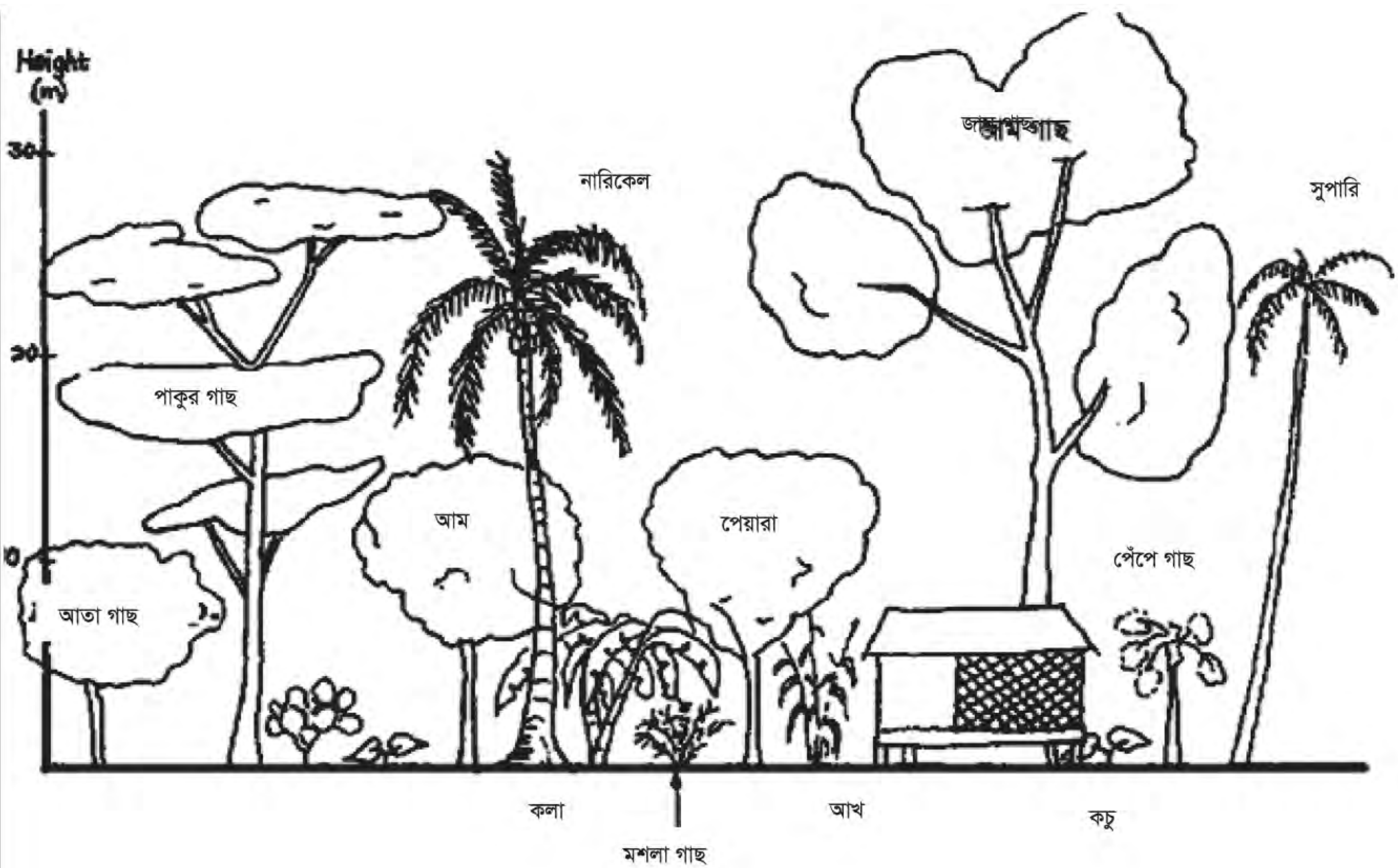

চিত্র ৪৫: বহুতলীয় মিশ্রচাষ

২. অ-শস্য সঙ্গী উদ্ভিদের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি

বেশ কিছু অ-শস্য উদ্ভিদ কৃষিক্ষেতে লালন করা প্রয়োজন, এমনকি চাষ করাও দরকার। এরা মাটির পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে ও শস্যের রোগ-বালাই ও শত্রু পোকা দমনে সাহায্য করে।

ক. পুষ্টি উপাদান সরবরাহ

ধইঞ্চা (*Sesbania cannabina*) খাদ্যশস্য না হলেও মাটিতে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধির জন্য চাষ করা দরকার। লজ্জাবতী (*Mimosa pudica*), কালকাসুন্দে (*Cassia sophera*), কাঞ্চণ/কুরুবক (*Bauhinia variegata*) (চিত্র ৪৬) কৃষিক্ষেতে লালন করলে মাটিতে পি. এস. এম. ও নাইট্রোজেন আবদ্ধ জীবাণু বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণচূড়া (*Delonix regia*), পলতে মাদার (*Erythrina suberosa*), করঞ্জ (*Pongamia pinnata*), শিরীষ (*Albizzia lebbek*) ও জিলিপীফল (*Inga dulcis*) গাছ (চিত্র ৪৭) ক্ষেতের ধারে থাকলে মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ অব্যাহত থাকে। ক্ষেতের জমা পানিতে শ্যাওলা ও টোপাপানা থেকে, পানিলং, শুষনি শাক, মালঞ্চ, কেশরদাম (চিত্র ৪৮) ইত্যাদি উদ্ভিদ পচলে মাটি পটাশিয়াম সমৃদ্ধ হয়।

ধইঞ্চা

কালকাসুন্দে

কাঞ্চণ/কুরুবক

চিত্র ৪৬ : মাটিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস বৃদ্ধিকারী ফসল

মাদার

জিলিপীফল

চিত্র ৪৭: ক্ষেতের ধারে এসব গাছ লাগিয়ে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ করা যায়

শুষনি শাক

মালঞ্চ

কেশরদাম

চিত্র ৪৮: এসব উদ্ভিদ পচলে মাটিতে পটাসিয়াম যোগ হয়

খ. বাড়তি সঙ্গী উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ

ক্ষেতে অতিরিক্ত ঘাস হয়ে গেলে তিল ও রেড়ি লাগিয়ে দিলে ঘাসের সংখ্যা কমে যায়। নিম (*Azadirachta indica*), মহানিম (*Melia azadirach*) ও করঞ্জ (*Pongamia pinnata*) (চিত্র ৪৯) গাছ থাকলে ঘাসের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। অড়হর ডাল আইলের ধারে ঘন করে লাগালে এর পাতা যেখানে পড়ে সেখানে মুখা ঘাস দমন হয়।

নিম

করঞ্জ

চিত্র ৪৯: এই গাছগুলো ঘাসের বৃদ্ধি ব্যহত করে

গ. শস্যের শত্রু পোকা দমন

শ্যাওড়া (*Streblus asper*) গাছ (চিত্র ৫০) ক্ষেতে থাকলে অনেক পাখি এসে বসে ও শস্যের শত্রু পোকা খেয়ে চাষীর উপকার করে। আকন্দ, রামতুলসী ও বনতুলসীর গন্ধ শস্যের অনেক শত্রু পোকা তাড়িয়ে দেয়। পানিলং ও বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস ধান, গম, জোয়ার ও যবের ক্ষেতে থাকলে শত্রু পোকাদের অধিকাংশ আক্রমণ ঘাসে চলে যায়, ফলে শস্য বেঁচে যায়।

শ্যাওড়া গাছ

আকন্দ গাছ

চিত্র ৫০: শ্যাওড়া ও আকন্দ

ঘ. শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ

শস্যের কিছু রোগ বিশেষ কয়েকটি অনুজীবের কারণে ঘটে। এই অনুজীবগুলো মাটির মধ্যে থেকে যায় এবং প্রতি বছর শস্য রোপন হলেই তাদের আক্রমণ করে। যেমনঃ টমেটোর উইল্ট রোগ, মাটির একটি বিশেষ অনুজীবের (ব্যকটেরিয়া বা ছত্রাক) সংখ্যা বেড়ে গেলে দেখা যায়।

ঘ-১) যদি কোন রাসায়নিক সার মাটিতে না দেওয়া হয়, এবং যথেষ্ট মাত্রায় অনুজীবের প্রজাতি বৈচিত্র্য মাটিতে থাকে তাহলে ঐ রোগের অনুজীবটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে কিছু বিশেষ প্রজাতির ছত্রাক ও সিউডোমোনাস প্রজাতির জীবাণু মাটিতে থাকলে উইল্ট রোগের জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তার সঙ্গে কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করলে ৭৪-৮১% রোগ নির্মূল হয়ে যায় এবং ২০- ৩৩% উৎপাদন বেড়ে যায়।[১৮]

ঘ-২) একই শস্যের ধারাবাহিক চাষ (মনোকালচার) একই জমিতে করলে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায় (চিত্র ৫১)। শস্যের কোন একটি রোগ যদি নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে পরবর্তী মৌসুমে ঐ শস্যটির রোপনকাল অনেকটা পিছিয়ে দিতে হবে, অথবা ক্ষেতের ঐ নির্দিষ্ট স্থানে তার পরিবর্তে অন্য কোনও শস্য বা অ-শস্য উদ্ভিদ চাষ করতে হবে।

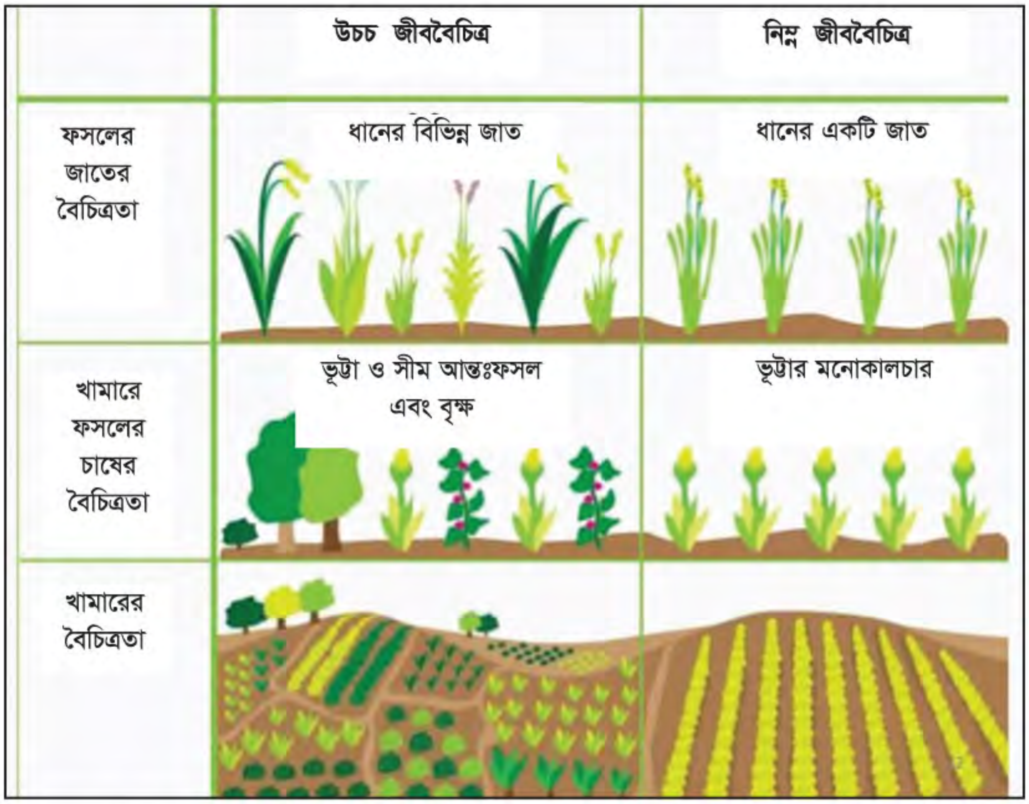

চিত্র ৫১: বহু ফসল এক জমিতে চাষ করে পোকা ও রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

সূত্র:www.slideshare.net/yosefalemu/ecological-agriculture-slide

ঘ-৩) যে শস্য প্রজাতিটি রোগাক্রান্ত হয়েছে বা হয়, তার কয়েকটি রোগ-প্রতিরোধী জাত নির্বাচন করে চাষ করলে সে রোগটি আর হবেনা। রোগপ্রবণ জাতের সঙ্গে রোগ-প্রতিরোধী জাত একসঙ্গে প্রতি সারিতে রোপন করলে রোগের সমস্যা দূর হয়।

ঘ-৪) একই প্রজাতির অনেকগুলো জাত এক সঙ্গে চাষ করলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূণ্য হয়ে যায়।[১৯] যেমনঃ একসঙ্গে ৪০ বা ৫০ টি জাতের ধান অনেক বছর ধরে চাষ করে দেখা গেছে, ধানের কোন রোগ-বালাই দেখা যায় না।

ঘ-৫) আলাদা আলাদা সারিতে এক এক প্রজাতির মিশ্র চাষ (১/অ-১), একই সারিতে বিভিন্ন প্রজাতি রেখে মিশ্র চাষ (১/অ-২), চক্রাবর্তী মিশ্র চাষ (১/আ) এবং বহুতলীয় মিশ্র চাষ (১/উ) করে দেখা গেছে রোগের প্রকোপ থাকে না।[২০]

ঘ-৬) বেশ কিছু অ-শস্য উদ্ভিদ প্রজাতি রোগ-জীবাণু প্রতিহত করতে পারে। যেমনঃ গাঁদা ফুল গাছ সবজিক্ষেতের মাঝে মাঝে লাগিয়ে রাখলে (চিত্র ৫২) শস্যের কান্ড ও শেকড়ের ছত্রাকজাতীয় রোগ হয় না। এধরনের উদ্ভিদ মিশ্র চাষের ক্ষেতে অন্তর্ভুক্ত করলে শস্যের রোগ- বালাই এড়ানো সম্ভব।

চিত্র ৫২: সবজি ক্ষেতে গাঁদাফুল গাছ

সূত্র:www.azplantlady.com/2010/11/sea-of-green-in-my-vegetable-garden.html

৩. কৃষি-ইকোসিষ্টেমের অন্তর্গত প্রাণীদের প্রজাতি বৈচিত্র্য বাড়ানো

মাটির নিচে অনুজীবদের বৈচিত্র্য ছাড়াও কৃমি, কেঁচো, কেন্নো, চ্যালা, সিউডোস্করপিয়ন ও গুবরে পোকার বিভিন্ন প্রজাতি বাস করে। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থ ক্ষেতের মাটিতে থাকলে এদের বংশবৃদ্ধি দ্রুত হয়। মাটির উপরে অজস্র পোকা, মাকড়সা, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের নানান প্রজাতি খাদ্যজালিকাকে সমৃদ্ধ করে। বাইরে থেকে কোনও বিষাক্ত বস্তু প্রয়োগ না করলে এরা কৃষি-ইকোসিস্টেমের স্বাভাবিক স্থায়িত্ব বজায় রাখে। জীববৈচিত্র শস্যক্ষেত্রের ইকোসিস্টেমের যে-সব কাজ করে দেয়, সেগুলো নিচে দেওয়া হল।

ক. পুষ্টি উপাদান সরবরাহ

জীববৈচিত্র্য যত বেশি থাকে, ঐ ইকোসিস্টেমের জটিলতাও তত বেশি হয়, এ কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। মাটির নিচের জীববৈচিত্র্যের প্রধান উপযোগিতা হল, উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের যোগান অব্যাহত রাখা। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ বর্জ্য পদার্থ ও মৃত বস্তুর উপাদানগুলোকে ভেঙে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী সার তৈরি করা এদের কাজ।

খ. শস্যের শত্রু প্রাণী দমন

কৃষি-ইকোসিস্টেমের কিছু প্রাণী সংখ্যায় বেশি হয়ে গেলে কোনও কোনও শস্যের ক্ষতি করে। মাটির বাসিন্দা কিছু কৃমি (নেমাটোড), মাজরা পোকা, পামরি পোকা, গন্ধী পোকা, চামটা পোকা (ফলছিদ্রকারী পোকা), চুঙ্গি পোকা ইত্যাদি অধিক সংখ্যায় থাকলে কিছু কিছু শস্যের ক্ষতি করে। এদের অনেকগুলোর স্বাভাবিক শত্রু প্রাণী কৃষি-ইকোসিস্টেমে থাকে। যেমন: মাকড়সা, ফড়িং, ঘুরঘুরে পোকা, ম্যান্টিস পোকা (চিত্র ৫৩), ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, শালিক, ফিঙে, দোয়েল, বাবুই, পেঁচা ইত্যাদি অজস্র প্রাণী ফসলের শত্রু পোকাদের খুব কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মাঝারি আকারের একটি হুতোম পেঁচা প্রতি রাতে প্রায় ৪০টি মাজরা ও গন্ধী পোকা খেয়ে নেয়। মাকড়সা ও ফড়িং যথেষ্ট সংখ্যায় থাকলে শ্যামা পোকার সংখ্যা দ্রুত কমে যায়।

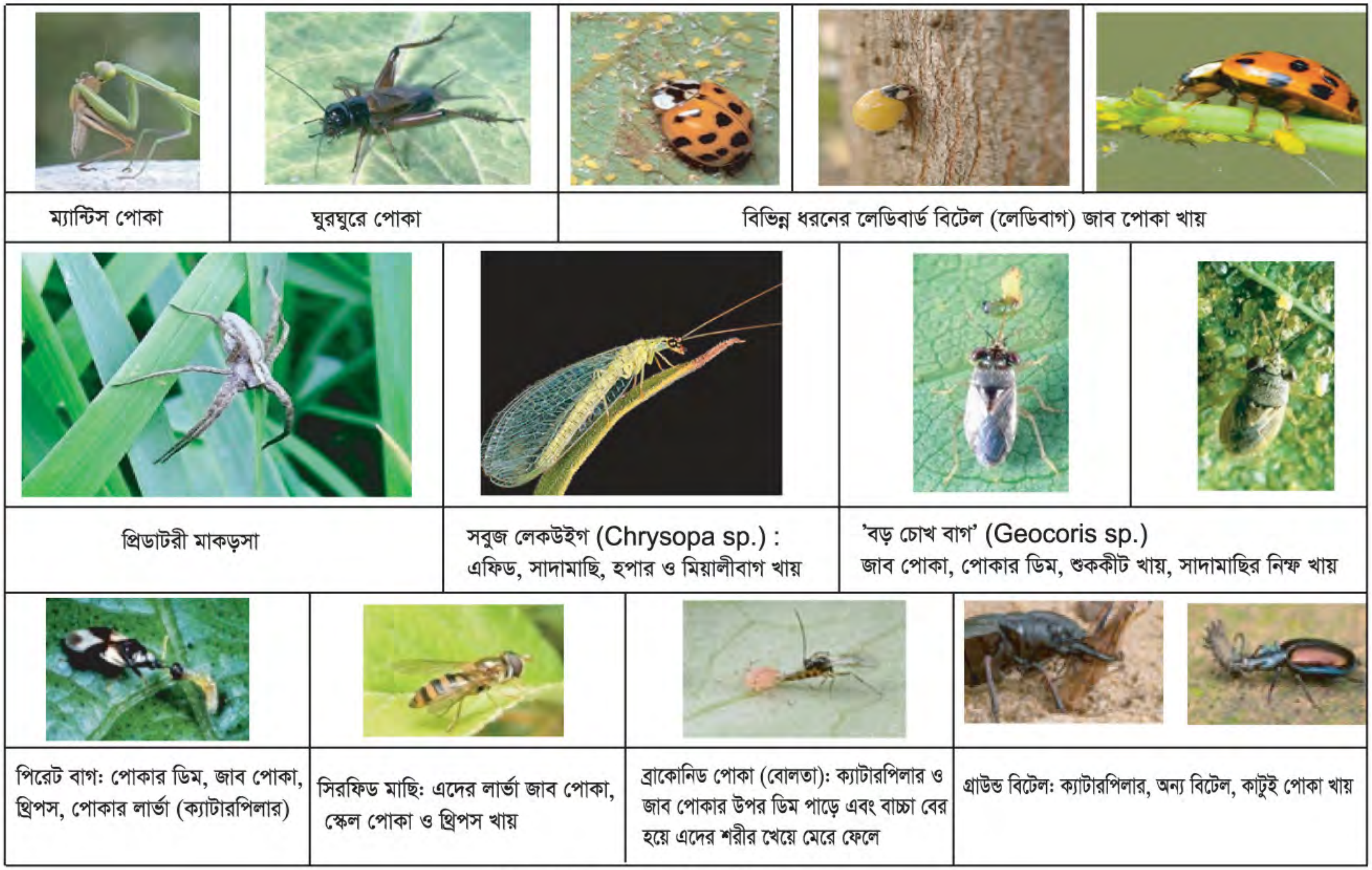

চিত্র ৫৩: বিভিন্ন ধরনের উপকারী পোকা

বিশেষ একটি বোলতা অনেক শত্রু পোকার শুককীটের শরীরে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে রাখে (চিত্র ৫৩, ব্রাকোনিড পোকা)। কিছুদিন পর এই ডিমগুলো ফুটে বোলতার শুককীটরা বেরিয়ে পোষক পোকার দেহের ভেতর থেকে মাংস খেয়ে তাদের মেরে ফেলে বেরিয়ে আসে। এভাবে শস্যের শত্রু পোকার বংশবৃদ্ধি ব্যহত হয়।

ট্রাইকোগ্রামা নামক ডিম পরজীবি পোকা (চিত্র ৫৪) বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন করে। তাছাড়া ব্রাকন নামক পরজীবিও (চিত্র ৫৪) জমিতে থাকলে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন হয়।

ট্রাইকোগ্রামা (*Trichogramma chilonis*) ব্রাকন (*Bracon hebetor*)

চিত্র ৫৪: পরজীবি পোকা ট্রাইকোগ্রামা ও ব্রাকন

বাইরে থেকে বিষ প্রয়োগ না করলে শস্যের শত্রু পোকাদের নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। বিশেষত, যদি ক্ষেতের মধ্যে শত্রু পোকাদের ভক্ষক প্রাণীদের যথেষ্ট বাসস্থান ও বংশবিস্তারের সুযোগ থাকে। এসব প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও খাদ্য জালিকার মধ্যে নির্দিষ্ট অবস্থান তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গৃহপালিত পশুরাও কৃষি-ইকোসিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। গরু বা মহিষ কৃষকের ক্ষেতে থাকলে অনেক উদ্ভিদের ক্ষতিকর বৃদ্ধি রোধ হয়। গোবরের ব্যবহার বলাই বাহুল্য। গোমূত্র পচিয়ে পানিতে (১ঃ৬) দ্রবীভূত করে স্প্রে করলে শস্যের অধিকাংশ শত্রু পোকা মারা যায়।

গ. শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ

শস্যের কিছু রোগ-জীবাণু ও ভাইরাস বিশেষ কিছু পতঙ্গের দ্বারা বাহিত হয়, যেমনঃ ধানের গ্রাসি স্টান্ট ভাইরাসের বাহক শ্যামা পোকা (চিত্র ৫৫)। এই ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক এখনও আবিস্কার হয়নি। কিন্তু কৃষি-ইকোসিস্টেমে যদি শ্যামা পোকার ভক্ষক প্রাণীরা যথেষ্ট সংখ্যায় থাকে, তাহলে এ রোগ হয়না।

চিত্র ৫৫: ধানের গ্রাসি স্টান্ট ভাইরাস রোগ

৪. কৃষি-ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত অনুজীবদের প্রজাতি বৈচিত্র্য বাড়ানো

ডাল ও শিম জাতীয় শস্যের চাষ করলে নাইট্রোজেন আবদ্ধ জীবাণুদের প্রজাতি বৈচিত্র্য ও সংখ্যা দুটোই বাড়বে। এছাড়াও লজ্জাবতী, কৃষ্ণচূড়া, কালকাসুন্দে ইত্যাদি অ-শস্য উদ্ভিদ ক্ষেতে রাখলেও এ জাতীয় জীবাণুদের বৈচিত্র্য বাড়ে (উপরে ২/ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

'ফসফরাস দ্রবীকরণী অনুজীব' (পি. এস. এম.)- দের মধ্যে, বিশেষত ছত্রাকের বৈচিত্র্য বাড়াতে সাহায্য করে পেঁপে, কচু, ঘাস, ধান ইত্যাদি উদ্ভিদ, যাদের শেকড়ে এই ছত্রাকদের মাইসেলিয়াম আশ্রিত হয় (উপরে ১/ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বিভিন্ন জাতের ছত্রাক শস্যের শেকড় ও কান্ডের রোগের জন্য দায়ী। এসব রোগবাহী ছত্রাকদের নষ্ট করে দেয় ট্রাইকোডার্মা জাতীয় এক উপকারী ছত্রাক। বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস জমিতে রাখলে এবং কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করলে ট্রাইকোডার্মার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বাড়ে।

যে ক্ষেতে ট্রাইকোডার্মা ও উপকারী অনুজীবের প্রজাতি বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে ট্রাইকোডার্মার স্পোর সংগ্রহ করে প্রয়োগ করা যায় (চিত্র ৫৬)। এজন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যায়।

চিত্র ৫৬: ট্রাইকোডার্মা স্পোর

সূত্রঃ www.indiamart.com/uniadira-agro/bio-fertilizers.html

৫. আরণ্যক কৃষি

আদি কৃষকেরা শস্যের চাষ শুরু করেছিলেন অরণ্যের মধ্যে কিছুটা এলাকা থেকে ছোট-বড় অনেক গাছ অপসারণ করে সেই এলাকায় শস্য বীজ বপন করে। এ ধরনের শস্যচাষে তাঁরা ধান, যব, বাজরা, জোয়ার, ভূট্টা ইত্যাদি দানাশস্যের সঙ্গে বিভিন্ন সবজি ও ফলের চারাও লাগাতেন। সমস্ত ফসল তোলার পর পরের বছর তাঁরা অরণ্যের অন্য একটি অঞ্চল পরিষ্কার করে চাষের ব্যবস্থা করতেন। প্রথম বছরে যে এলাকায় চাষ হয়েছিল সেখানে ৩০, ৪০ বা ৫০ বছর পর আবার ফিরে এসে চাষ করতেন। ইতোমধ্যে অনাবাদী অবস্থায় অসংখ্য বৃক্ষ, গুল্ম ও বীরুৎ প্রজাতি বেড়ে গিয়ে এলাকাটিকে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করে দিত।

এই পদ্ধতির চাষ দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার অনেক দেশে এখনও চালু আছে। এ চাষের প্রাথমিক অবস্থায় অরণ্যের একটি ছোট এলাকা চিহ্নিত করে সেখানকার বেশ কিছু বৃক্ষ ও গুল্মদের কেটে ও আগুনে পুড়িয়ে অপসারণ করা হয়। তারপর সেখানে দানা শস্য, সবজি, মশলা ও ফলের বীজ বপন করা হয়। সচরাচর পাহাড়ি অরণ্য এলাকায় এই চাষকে জুম বা ঝুম চাষ বলে। এক বা দুই বছর পর এই চাষের ক্ষেত পরিত্যাগ করে কৃষকরা অরণ্যের অন্য আরেকটি এলাকায় চলে যান। এইভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এলাকায় জুম চাষ করার পর প্রথম এলাকাটিতে আবার ফিরে আসতে ২০, ৩০, এমনকি ৫০ বছরও লাগে। এই সময়ের মধ্যে পরিত্যক্ত এলাকাগুলো জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হয়ে আবার গভীর অরণ্য হয়ে যায়।

জুম চাষে বৃক্ষ ও গুল্মদের পুড়িয়ে দেয়ার জন্য যে আগুন ধরানো হয়, সেটা এমন পদ্ধতিতে হয় যে ছাই-এর চেয়ে অনেক গুন বেশি কাঠকয়লা উৎপন্ন হয়। এই কাঠকয়লা জমির উপরিস্তরে জমে মাটির অনুজীব বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে, এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে। শস্য বোনার পদ্ধতি ও শস্যের প্রজাতি নির্বাচন এই মিশ্রচাষে এমন হয় যাতে জীববৈচিত্র্য ও কৃষি-ইকোসিস্টেমের জটিলতা বহুগুণ বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে এই জুম চাষ বিশ্বের সর্বাধিক উৎপাদনশীল, পরিবেশবান্ধব ও মাটির সংরক্ষণে সবচেয়ে কার্যকরী কৃষি পদ্ধতি।[২১] আধুনিক আইনানুগ অরণ্য ব্যবস্থাপনার ফলে জুম চাষের যে জমি কমপক্ষে ৩০ বছর অনাবাদী ফেলে রাখা যেত, আজ সেই জমি ৩- ৪ বছরের বেশি অনাবাদী রাখা যাচ্ছে না। বনের এলাকার অধিকার এই কৃষক সম্প্রদায়ের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার ফলে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এখন জুম চাষের অনাবাদী পর্যায়কাল অনধিক ৪ বছর হয়ে গেছে। ফলে অরণ্যের জীববৈচিত্র্য আগের অবস্থায় আর ফিরে যেতে পারছে না, বরং ভূমিক্ষয় ও প্রজাতি বিলুপ্তির হার বেড়ে চলেছে।

যে কৃষি ব্যবস্থা স্বাভাবিক অরণ্যের বিপুল জীববৈচিত্র্য ও ইকোসিস্টেমের জটিলতার আদর্শে শস্য ও অ-শস্য উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রাণীর সংমিশ্রণ সৃষ্টি করে, সেটি সবচেয়ে বেশি ঘাতসহ ও সুস্থায়ী হয়।

চিত্র ৫৬: জুমচাষ

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিতে নারী

কৃষির উদ্ভব নারীর হাতে। প্রায় বার হাজার বছর আগে শিকার ও সংগ্রহজীবী আদি মানুষেরা বীজ থেকে উদ্ভিদের চারার উদগম লক্ষ্য করেছিলেন। এই পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগিয়ে নিজের বাসস্থানের সংলগ্ন জমিতে ফল বৃক্ষের বীজ লাগিয়ে প্রথম কৃষির উদ্ভব করেছিলেন নারীরা।[২২] পরবর্তীতে বীজ ও ফসল সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কৃষির আদি যুগ থেকে বীজ নির্বাচন, সংরক্ষণ ও বপনের সমস্ত কাজ নারীরাই করতেন ও আজও করেন। বিভিন্ন শস্যের জাতের বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক পার্থক্য (পাতার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, কান্ডের রঙ, বীজের আকার ও আকৃতি ইত্যাদি) নারীরা লক্ষ্য করতেন ও সেই অনুযায়ী বিভিন্ন জাত সংরক্ষণ করতেন। কোন্ শস্যের জাত কি ধরনের মাটিতে, কোন পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত, সেই জ্ঞানও তাঁদের ছিল। আধুনিক কৃষিতে, যেদিন থেকে বীজ বাজার থেকে কেনার প্রচলন হয়েছে, নারীদের এই বীজ সম্পর্কিত জ্ঞান ও কাজের মূল্য ক্রমশ হারিয়ে গেছে।

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে স্থানীয় পরিবেশে খাপ খাওয়ানো নির্বাচিত শস্যের জাতের উপর। এসব জাতের বীজ সংরক্ষণ করতে সাবেকী জ্ঞানভান্ডারের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। কোন্ মৌসুমে কি ধরনের মাটিতে কোন্ কোন্ শস্যের চাষ যুক্তিযুক্ত; শস্যের কোন্ কোন্ জাত প্রতিকূল পরিবেশে (খরা, অতিবৃষ্টি, অনেক দেরীতে বৃষ্টি ইত্যাদি) ফলন দিতে পারে; কোন্ শস্যের সঙ্গে কোন

চিত্র ৫৮: কৃষক বিভিন্ন ধরনের বীজ সংগ্রহ করছেন

উদ্ভিদ উপযুক্ত সঙ্গী হিসেবে চাষের ক্ষেতে রাখা যায়; প্রতিটি শস্যের বীজ কোন পদ্ধতিতে পরবর্তীকালে চাষের জন্য সংরক্ষণ করা যায় - এসব জ্ঞান কৃষক সমাজে নারীর আয়ত্তে ছিল। গ্রামের যেসব বয়স্কা মহিলাদের স্মৃতিতে সাবেকী শস্য বীজ সম্পর্কিত জ্ঞান ও বীজ সংরক্ষণের প্রযুক্তির বিদ্যা এখনও টিকে আছে, তাঁদের কাছ থেকে এই জ্ঞান পুনরুদ্ধার করে নতুন প্রজন্মের কৃষকদের শিখে নেওয়া আশু প্রয়োজন।

চিত্র ৫৯: বসতবাড়িতে ফসল চাষ করে বিষমুক্ত খাদ্য ও পারিবারিক খাদ্যের যোগান দেওয়া যায়

সামূহিক (কমিউনিটি) সম্পদের উপর অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সত্তর দশকের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র যাবতীয় শস্যবৈচিত্র্যের ভান্ডার ছিল কৃষকের হাতে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রতিটি শস্য প্রজাতি ও তার অজস্র জাত কৃষকরাই সৃষ্টি করেছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান বা বিনিময়ের মাধ্যমে হাজার হাজার জাতের শস্য সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ জাতগুলোর মধ্যে খরাসহনশীল, বন্যাসহনশীল, লবণাক্ততাসহনশীল, বিভিন্ন রোগ ও শত্রু পোকা প্রতিরোধী বিভিন্ন জাত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা হত। স্থানীয় জলবায়ু ও মাটিতে খাপ খাওয়ানো এসব জাতের বীজ কৃষকরা বিনামূল্যে নিজেদের মধ্যে বিনিময় করতেন। শস্য বীজকে ধরা হত সামূহিক সম্পদ, যার উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা ছিল না।

বীজ যে সামূহিক সম্পদ, এই ধারণা ভেঙে দেওয়া হল সবুজ বিপ্লবের পর থেকে। সত্তর দশক থেকে বীজের বাজার সৃষ্টি হয় এবং মুষ্টিমেয় কিছু বীজ কোম্পানি শস্য বীজের বাজার দখল নিয়ে নেয়। তারপর থেকে কৃষকের ঘরের বীজ মূল্যহীন হয়ে পড়ে, কারণ এসব বীজ বাজারের বাইরে থেকে যায়। যে বীজ সরকারি প্রচেষ্টায় সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়, সেসবই বীজ কোম্পানির অধিকৃত বীজ অথবা সরকারি কৃষি গবেষণাগারে প্রস্তুত বীজ। এই বীজগুলো দুই বছরের বেশি কৃষকরা চাষ করতে পারেন না, কারণ এই জাতের শস্যবীজের গুণাবলী দুই বছরের পরে নষ্ট হয়ে যায়। অতএব প্রতি দুই বা তিন বছর অন্তর কৃষক নতুন বীজ কিনতে বাধ্য হন। এই বীজের বাজার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বীজের উপর কৃষক সমাজের মুক্ত অধিকার ক্রমশ শেষ হয়ে, বীজ ব্যবসায়ীদের বানিজ্যিক স্বার্থরক্ষা সুনিশ্চিত হয়। আজ বীজের আদান-প্রদান বা বিনিময় দেশের কোথাও তেমন দেখা যায় না। সকলেই যে কোন শস্যের চাষের জন্য বাজারলভ্য বীজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

বীজের উপর পরম্পরাগত সামূহিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে, প্রথমেই বীজ বিনিময়ের সাবেকী প্রথা ফিরিয়ে আনতে হবে। একাজে প্রথম বাধা হল সাবেকী বীজ সম্পদের অলভ্যতা। অধিকাংশ শস্যের স্থানীয় জাতের বীজগুলো হারিয়ে গেছে, আরও যাচ্ছে। যে অল্প সংখ্যক জাতের বীজ মুষ্টিমেয় কিছু কৃষকের ক্ষেতে আজও চাষ হয়, তাদের সন্ধান পাওয়া দুস্কর। সুতরাং এক এলাকার কৃষক অন্য এলাকার ধান বা বেগুনের বীজের সন্ধান জানেন না।

যেসব স্থানীয় জাতের বীজ এখনও টিকে আছে, সেগুলো সংগ্রহ করে এলাকাভিত্তিক বীজ ভান্ডার (চিত্র ৬০) গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। এই বীজ ভান্ডারে কৃষকরা তাদের বীজের নমুনা দান করবেন এবং বিনিময়ে অন্য জাতের বীজ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সংগ্রহ করবেন - বিনামূল্যে। বাজার নির্ভর অর্থনীতির বিপরীতে এই সম্পদ বিনিময়ের প্রথা পুনঃপ্রবর্তন হলে সামূহিক অধিকার এবং সামূহিক সম্পদের মূল্য চেতনা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

চিত্র ৬০: যৌথ বীজ ভান্ডারে বয়ম-এ বীজ সংরক্ষণ

ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে স্থানীয় মানুষরা তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন বস্তু সামূহিক সম্পদের অন্তর্গত করে বিনিময় করা শুরু করে দিয়েছেন।[২৩] সাইকেল, করাত, কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হলে সামূহিক বস্তুভান্ডার থেকে চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। তার নিজের মালিকানায় একটি সাইকেল থাকলে সামূহিক প্রয়োজনে তিনি সেটি ধার দিবেন, আবার তার প্রতিবেশীর হাতুড়ি নিজের দরকারে সামূহিক বস্তুভান্ডার থেকে ধার নিতে পারেন। এই সামূহিক সম্পদের ব্যবহারের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরতা এবং সম্পদকে মিলেমিশে ভাগ করে ব্যবহার করা - সামূহিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান চিহ্ন। সামূহিক বীজ ভান্ডার এই সামূহিক প্রতিষ্ঠান আন্দোলনের প্রাথমিক সোপান হতে পারে।

আধুনিক সমাজে খাদ্য উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে বীজ ও কৃষি সরঞ্জাম কেনা থেকে ফসল বিক্রি পর্যন্ত ব্যক্তি কৃষক বা কৃষক পরিবার বাজারের উপর নির্ভরশীল থাকেন। এই নির্ভরতা প্রধানত মুষ্টিমেয় কয়েকটি কোম্পানির উপর। যেমনঃ বাজারলভ্য সমস্ত শস্য বীজ মনস্যান্টো/বায়ার ও সিনজেনটা কোম্পানীর মালিকানায়; কিংবা কীটনাশক, উদ্ভিদনাশক, সেচের পাম্পসেট-সবকিছুই বিদেশী কিছু কোম্পানির দখলে। কৃষক ফসল বিক্রি করতে গেলে তার দাম নির্ধারণ হয় বাজারদর অনুযায়ী, যে বাজারদরের উপর উৎপাদক ও ক্রেতার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। উৎপাদিত ফসলের দামের উপর ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে, এমন ব্যবস্থা সম্ভব শুধু স্থানীয় উৎপাদকদের হাটে। যেখানে উৎপাদক বিক্রেতা সরাসরি সাধারণ ক্রেতাকে তাঁর নিজের ক্ষেতের ফসল স্বনির্ধারিত মূল্যে স্বাধীনভাবে বেচতে পারেন। উৎপাদকদের হাট চালু থাকলে বাইরের ফড়িয়া, দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী বীজ বা ফসল - কোনটার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না।

উৎপাদকদের হাট আমাদের দেশে ও সারা পৃথিবীতে চালু ছিল হাজার হাজার বছর, যতদিন না বীজ ও ফসলের উপর ব্যবসায়ীদের মালিকানা আইনসিদ্ধ হয়। আধুনিক পৃথিবীতে চাষীদের বা উৎপাদকদের হাট দেশজুড়ে প্রথম চালু হয় কিউবাতে। বিগত বিশ বছরের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ইউরোপের ছয়টি দেশে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে উৎপাদকদের হাট চালু হয়ে গেছে, এবং এই আন্দোলন ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের দেশে এরকম হাট এখনও চালু আছে অনেক গ্রামে। সুতরাং সুস্থায়ী কৃষিপদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসলের বন্টনের জন্য এই হাট আন্দোলন আমাদের দেশে শুরু করা কঠিন হবেনা।

চিত্র ৬১: কমিউনিটিতে উৎপাদকের হাট

উপসংহার

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি হল কতগুলো চর্চা বা কাজের সমষ্টি যার মাধ্যমে কৃষিকাজকে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই ও মজবুত করে। এর লক্ষ্য হল পুষ্টিসমৃদ্ধ ও রাসায়নিকমুক্ত ফসল ফলানো। এ ধরনের কৃষিকাজ ইকোসিষ্টেমকে সুসংহত ও পুনরুদ্ধার করে। বাইরের উপাদান, যেমন: রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয়, যেখানে এসব উপাদান তৈরিতে অনেক শক্তি খরচ হয়, আমাদের খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় এবং ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে ছড়ায়। এছাড়া এসব উপাদান মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর কারণ এগুলো রাসায়নিক ও কৃত্রিম উপাদানে তৈরি। অন্যদিকে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি হল কৃষিখামারের নিজস্ব সম্পদ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া গাছ, বৃক্ষ, পাখি, প্রাণী, পোকা এবং অনুজীব এর যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার, যেখানে এসবের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্ক বজায় থাকে। এই চাষ পদ্ধতি মাটির উপরের ও নীচের ভূমি ও পরিবেশ উভয়ই রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়। অতিরিক্ত বালাই, কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য, শস্যহানি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি খুব ভালভাবে খাপ খায় এবং যে পদ্ধতি ভূমি, মাটি ও ফসল উৎপাদনে সহায়ক এবং বছরের পর বছর তা অব্যাহত থাকে।

বিশ্বের মোট খাদ্যের ৭০ ভাগই উৎপাদন করে ক্ষুদ্রচাষীরা যা মোট জমির ২৫ ভাগে উৎপাদন করে। দূর্ভাগ্যক্রমে, তাঁদের পর্যাপ্ত জমি নেই ও তাঁদের নিয়ন্ত্রণে কোন বাজার নেই, তাঁরা বিশ্বের সবচেয়ে গরিব মানুষ এবং বিশ্বের মোট ক্ষুধার্তের ৭০ ভাগই তাঁরা। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি সামাজিকভাবে দিন দিন অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যেখানে কৃষক কমিউনিটির অধিকারকে স্বীকৃতি ও সন্মান করা হয় যাতে তাঁরা কি উৎপাদন করতে চায় এবং কিভাবে উৎপাদন করবে তা তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়। জীববেচিত্র্য নির্ভর কৃষি খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়, যা বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন উপায়ে আয় করতে পারে। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি শুধু পরিবেশকেই ভাল রাখেনা, সাথে সাথে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য আনয়নে অবদান রাখে। আফ্রিকার ক্ষুদ্র চাষিরা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষের মাধ্যমে তিন থেকে ১০ বছরের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশী ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছে।[২৪] মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুগত পরিবর্তনে খাপ খাওয়া, স্থানীয় ও দেশীয় প্রযুক্তিচর্চা এবং বহুশস্য চাষের জন্য কৃষকরা জীববৈচিত্র্য নির্ভর

চাষ করে থাকেন। স্বল্প সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ছোট কৃষকরা প্রতি একক উৎপাদনের উপর আয় করেন, সর্বোপরি কৃষকের মোট আয় বেড়ে যায়। এই চর্চা ফলনের নিশ্চয়তা দেয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি চর্চায় দৈনন্দিন পারিবারিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও পরবর্তী মৌসুমের জন্য খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। কৃষক খাদ্য ফলান তাঁর এবং তাঁর পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য। এবং সে খাদ্যের জন্য বাজারের উপর কম নির্ভর করে। যাঁরা প্রচলিত কৃষি অর্থাৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে চাষ করে থাকেন, তাঁদের তুলনায়, যে-কৃষক জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাঁর খাদ্য নিরাপত্তা, শস্য বৈচিত্র্যতা ও খাদ্য বৈচিত্র্যতার নিশ্চয়তা অধিকতর। তার উপর এই চর্চাটি রাসায়নিক সার মুক্ত বিধায় উৎপাদিত খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর। শেষ ফসল সংগ্রহ থেকে রেখে দেয়া বীজ কৃষক পুনরায় চাষ করতে পারেন। এতে বীজের জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কমে যায়। যেহেতু সংগৃহিত বীজগুলো নিজেরাই নির্বাচন ও বাছাই করে নেন, তাই বাজারের বীজের চেয়ে এ বীজের গুনাগুণ অনেক বেশী থাকে। এ বীজগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কারণ এগুলো স্থানীয় আবহাওয়ায় প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত।

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি চর্চায় জৈব সারের জন্য পশুপালন করা হয় এবং প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত সার ব্যবহার করা হয় যা সরাসরি খামার থেকে পাওয়া যায় বা বসতবাড়ির আবর্জনা থেকে তৈরি হয়। এটি সরাসরি খামারের বিনিয়োগ কমায়।

খাদ্য সার্বভৌমত্ব মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করে, তারা কি খাবে এবং কি চাষ করবে এবং যা হবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে উৎপাদিত ও সকলের জন্য সহজলভ্য। স্থানীয় ও আঞ্চলিক খাদ্যে ও বাজারে প্রবেশ করার অধিকার সর্বপ্রথমে স্থানীয় কৃষকের থাকবে। তাদের উৎপাদিত ফসল বহুজাতিক কোম্পানি বা আমদানি করা পণ্যের চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার পাবে। স্থানীয় বাজারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে স্থানীয় কৃষকদের কাছে। পণ্যের মূল্য কৃষকরা নির্ধারণ করবে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া যাবেনা। তাদের পছন্দ অনুসারে তারা কি খেতে চায় এবং চাষ করতে চায় এবং স্থানীয় খাবার নির্বাচনে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কৃষক সম্প্রদায়ের থাকবে। চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা বিশ্বকে খাওয়াতে পারবে, কিন্তু খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তার মাধ্যমে ছোট কৃষকের সুস্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার ও প্রাপ্য সন্মান দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে কৃষি খামারের সামগ্রিক সম্পদ যেমনঃ ভূমি, পানি, বীজ এবং আয় এর উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কৃষকের এই্ সামগ্রিক উন্নয়নে জৈবনির্ভর কৃষির কোন বিকল্প নেই, তাই এর প্রসারে দেশের কৃষকসহ কৃষি সংশ্লিষ্টদের গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

সংযুক্তি -১

বিভিন্ন পরিবারের ফসলের ছবি

১. দানাশস্য পরিবারঃ ধান, গম, ভূট্টা, যব, জোয়ার, কাউন, বাজরা

ধান

গম

ভূট্টা

যব/বার্লি

জোয়ার/সরগম

কাউন/মিলেট

২. কচু পরিবারঃ ওল, মেটে আলু, মান কচু, গুড়ি কচু, পঞ্চমুখী কচু, শোলা কচু, কালো কচু

ওল

মেটে আলু

মান কচু

গুড়ি কচু

পঞ্চমুখী কচু

শোলা কচু

৩. বেগুন পরিবারঃ বেগুন, টমেটো, আলু, মরিচ, ক্যাপসিকাম

বেগুন

টমেটো

আলু

মরিচ

ক্যাপসিকাম

৪. পেঁয়াজ পরিবারঃ পেঁয়াজ, রসুন

পেঁয়াজ

রসুন

৫. বীট ও ডাটা পরিবারঃ বীট, লালশাক, ডাটা শাক (সাদানটে), পালং শাক, লেটুস, পুঁইশাক

বীট

লালশাক

ডাটা শাক

পালং শাক

লেটুস

পুঁইশাক

৬. ডাল পরিবারঃ মসুর, মুগ, অড়হর, শাকালু, বরবটি, শিম

মসুর

মুগ

অড়হর

শাকালু

বরবটি

শিম

৭. কুমড়া পরিবার: শসা, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, খিরাই, চাল কুমড়া, পটল, ঝিঙ্গা, কাকরোল, চিচিঙ্গা

শসা

তরমুজ

মিষ্টি কুমড়া

লাউ

খিরাই

চাল কুমড়া

পটল

ঝিঙ্গা

কাকরোল

৮. কপি পরিবার: ফুলকপি, বাধাকপি, ব্রকোলি, ওলকপি, সরষে, শালগম, মূলা

ফুলকপি

বাধাকপি

ব্রকোলি

৯. ঢেঁড়স পরিবারঃ ঢেঁড়স, মেস্তা পাট, চুক ফল

ওলকপি

মুলা

শালগম

ঢেঁড়স

মেস্তা পাট

চুক ফল

১০. ধনে পরিবারঃ ধনে, গাজর, মৌরি

ধনে

গাজর

মৌরি

১১. আদা পরিবারঃ আদা, আমাদা, হলুদ

আদা

আমাদা

হলুদ

তথ্যসূত্র

1 http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page 1b1eb 817_ 9325_4354_a756_3d18412203e2/Yearbook-2016-Final-19-06-2017.pdf (page no. 03)

2 http://www.moa.gov.bd/site/page/4fb627c0-d806-4a7e-a1cd-b67d4bc85159/% E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6% B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0% A6%82% E0%A6% B2%E0%A6% BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0% A6%B6-%E0%A6% 95%E0% A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF

3 BBS (2015).Yearbook of Agricultural Statistics.Ministry of Planning, Peoples Republic of Bangaldsh.Pp.39 & 41.

4 http://moa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moa.portal.gov.bd/page/1c14d 98e_0afe_4807_8320_ff5257fcc7b8/seed_distribution_list_2013.jpg

5 http://www.dhakatribune.com/business/2016/08/11/govt-import-60k-tonnes-mop/

6 https://www.bb.org.bd/econdata/import/categoryimp.php

7 https://www.mof.gov.bd/en/budget/16_17/mtbf/en/43_Ministry%20of%20Agri culture_English.pdf (page no. 502)

http://en.prothom-alo.com/economy/news/147979/Next-budget-to-see-%E2% 80%98subsidy-cut%E2%80%99

8 http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/1b1eb817 _9325_4354_a756_3d18412203e2/Yearbook-2016-Final-19-06-2017.pdf (page no. 400)

9 FAO (2010).Trends of yield and productivity of modern rice in irrigated rice ysstems in Asia.http://www.fao.org/docrep/v6017T/V6017T03. htm.

10 Smith, A. H. EO Lingas and M. Rahman (2000). Contamination of drinking water by arsenic in Bangladesh: a public health emergency. *Bulletin of World Health Organization* 78(9): 1093-1103.

11 UNHRC (2017).Report of the Special Rapporteur on the right to food.United Nations Human Rights Council. Report No. A/HRC/34/48.

Pirsaheb, M., M. Limoee, F. Namdari and R. Khamutian 2015. Organoichlorine pesticides residue in breast milk: a systematic review. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran* 29: 228.

12 Aktar, M. W., D. Sengupta and A. Chowdhury (2009). Impact of pesticides use

in agriculture: their benefits and hazards. *Interdisciplinary Toxicology* 2: 1-12.
Relyea, R. (2009). A cocktail of contaminants: how mixtures of pesticides at low concentrations aVect aquatic communities.*Oecologia.* 159: 363-376.

13 Gliessman, Stephen B. (2007). *Agroecology: The ecology of sustainable food systems*. CRC
Press.Boca Raton/London.
Altieri, M.A. 2015. *Agroecology: Key Concepts, Principles and Practices*. Penang: Third World Network.
FAO (2015).*Agroecology for Food Security and Nutrition*.Proceedings of the FAO International Symposium (18-19 September 2014). Rome. http://www.fao.org/3/a-i4729e.pdf.

14 Shiva, V., R. Holla Bhar, A. H. Jafri and K. Jalees (2002).*Corporate Hijack of Agriculture*.Navdanya. New Delhi.
ETC Group (2008). *Who Owns Nature?* Communiqué Issue #100. https://www.panna.org/sites/default/files/etc_WhoOwnsNature.pdf.

15 Jahan, G.S., L Hassan, S.N. Begum and S.N. Islam (2013).Identification of iron rich genotypes of rice in Bangladesh using chemical analysis.*Journal of Bangladesh Agriculture University* 11(1) 73-78.
Deb, D. S. Sengupta and T. Pradeep (2015).A profile of heavy metals in rice (*Oryza sativa* ssp. *indica*) landraces.*Current Science* 109: 407-409.

16 Roy, S., D. Deb and M. Poddar Sarkar (2017). The diversity of volatiles and semi-volatiles in selected indigenous rice varieties: an exploratory study. *Food Chemistry* (in press)
Deb, D. (2009). Biodiversity and complexity of rice food webs: An empirical assessment. *The Open Ecology Journal* 2: 112-129.

17 Srivastava R., Khalid A., Singh U.S. and Sharma A.K. (2010).Evaluation of arbuscular mycorrhizal fungus, fluorescent *Pseudomonas* and *Trichoderma harzianum* formulation against *Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici* for the management of tomato wilt.*Biological Control* 53: 24–31.

18 Zhu, Y.Y., Chen, H.R., Fan, J.H., Wang, Y.Y., Yan, L., Chen, J.B., Fan, J.X., Yang, S.S., Hu, L.P., Leung, H., Mew, T.W., Teng, P.S., Wang, Z.W. & Mundt, C.C. (2000). Genetic diversity and disease control in rice. Nature 406:718-722.

19 Chave, M., M. Tchamitchian, and H. Ozier-Lafontaine (2014).Agroecological engineering to biocontrol soil pests for crop health, pp. 269–297. In: Ozier-Lafontaine H., and M. Lesueur-Jannoyer (eds.), *Sustainable Agriculture Reviews* 14*: Agrocology and Global Change*. Springer.Berlin/New York.

20 Christantay, L. (1986). Shifting cultivation and tropical soils: patterns, problems, and
possible improvements, pp. 226-240. In: G.G. Marten (ed), *Traditional Agriculture in Southeast Asia: A Human Ecology Perspective*. Westview Press. Boulder, USA.

21 (2001).*Shifting Cultivation: Towards Sustainability and Resource Conservation*. IFAD, IDRC, CIIFAD, ICRAF & IIRR. Cavite, The Philippines.

22 Stanley, A. (1995). *Mothers and Daughters of Invention: Notes for a Revised History of Technology*. Rutgers University Press.

23 McKnight, J. and P. Block (2010).*The Abundant Community*.Berrett-Koehler Publishers. San Francisco.

24 "Agroecology and the right to food", UN Special Rapporteur on the Right to Food (2011).

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Banlgadesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research ("Gonogobeshona") on the development schemes that affect them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

The Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a Germany based foundation working in South Asia as in other parts of the world on the subjects of critical social analysis and civic education. It promotes a sovereign, socialist, secular and democratic social order, and aims to present alternative approaches to society and decision makers. Research organisations, groups for self-emancipation and social activists are supported in their initiatives to develop models which have the potential to deliver greater social and economic justice.